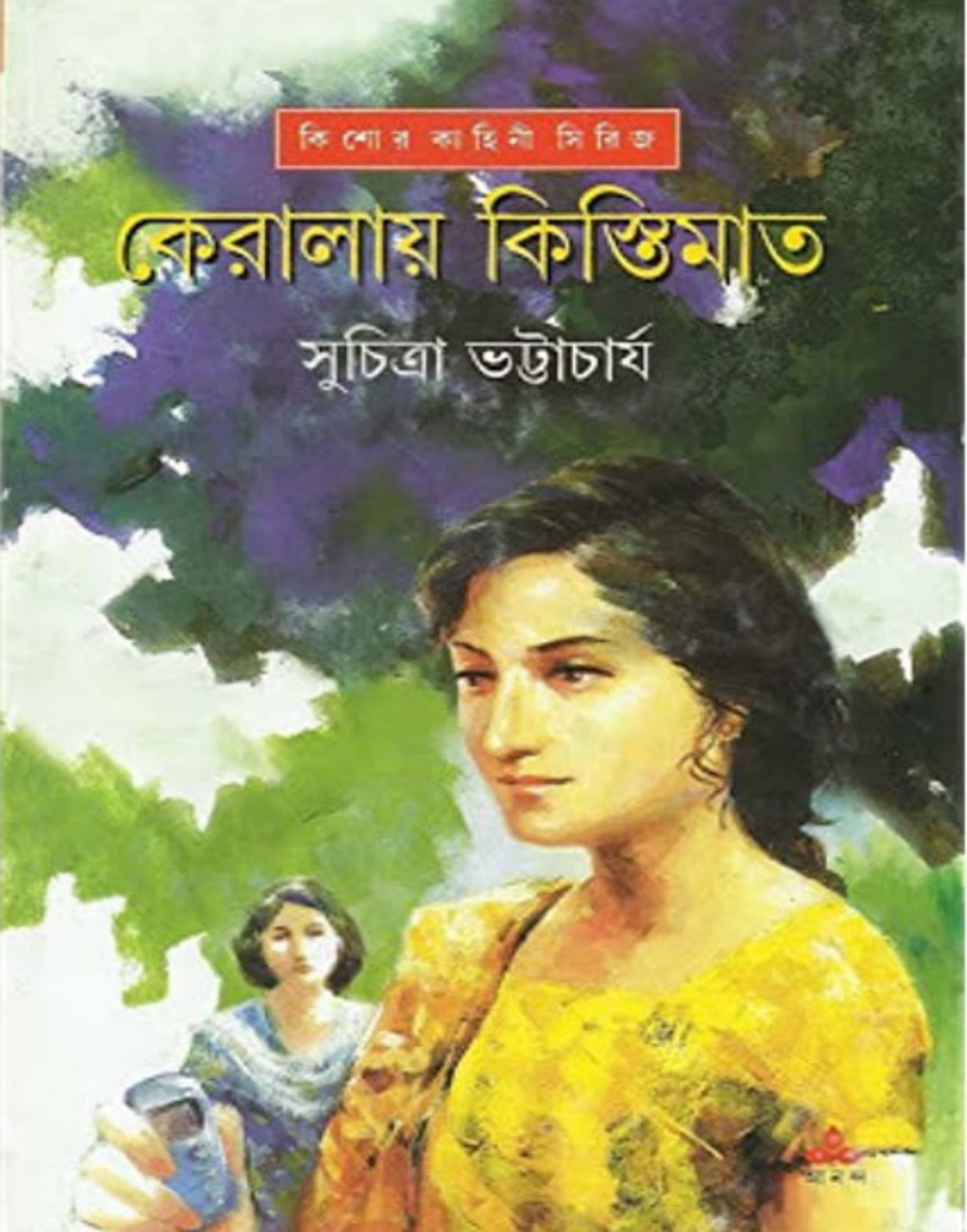

কিশোর কাহিনী সিরিজ
কেরালায় কিস্তিমাত
সুচিত্রা ভট্টাচার্য

বইয়ের নামঃ কেরালায় কিস্তিমাত

লেখকঃ সুচিত্রা ভট্টাচার্য

ভাষাঃ বাংলা

বইয়ের ধরণঃ উপন্যাস

প্রকরনঃ ইপাব (epub), মোবি(mobi)

পঠন সৌজন্যতাঃ ইবাংলা লাইব্রেরী

ই-বই তৈরিঃ আল মোস্তাইন বিল্লাহ

১-৩

০১.

ত্রিবান্দ্রম এক্সপ্রেস এর্নাকুলাম টাউন পেরনোর সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয়ে গেল নামার তোড়জোড়। পার্থ আর মিতিন সিটের তলা থেকে টেনেটেনে জিনিস বের করছে। টুপুরও হাত লাগাল মাসি-মেসোর সঙ্গে। গুনছে লাগেজ, মনে-মনে হিসেব রাখছে সুটকেস আর কিটব্যাগের। বুমবুমও বেজায় ব্যস্ত হঠাৎ। তড়িঘড়ি চিপস শেষ করছে। যেন স্টেশন এসে গেলে কেউ তার হাত থেকে ছিনিয়ে নেবে প্যাকেট। টুপুর একবার হাত বাড়াতেই ঝট করে সরে গেল বুমবুম। চিপসের মতো মহা মূল্যবান খাবার ভাগাভাগিতে সে মোটেই রাজি নয়।

টুপুরের মা বাথরুমে গিয়েছিলেন। ফিরেই বোতল থেকে ঢকঢক করে খানিক জল খেয়ে বললেন, কী রে মিতিন, তোর জামাইবাবু যে দেখি এখনও বসে বসে ঢুলছে! এবার তাকে একটু নড়াচড়া করতে বল।

একটু আগে বাবাকে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে জাগিয়েছে টুপুর। দুপুরে খাওয়াদাওয়ার পর জব্বর এক ঘুম লাগিয়েছিলেন অবনী। ওপরের বার্থ থেকে অবরোহণ করলেন এইমাত্র, এখনও তার ঘোর কাটেনি। হাই তুলতে তুলতে বললেন, আবার আমায় নিয়ে পড়লে কেন?

না বলে পারছি না, তাই।ট্রেনে ওঠার পর থেকে তো কুটোটি নাড়নি।রাত্তিরে তোমার চাদরকম্বল পর্যন্ত পেতে দিতে হয়েছে।এবার অন্তত কিছু করো।

আহা, ওরা করছে তো।কেন মিছিমিছি ওদের ডিসটার্ব করব।জানোনা, অধিক সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট!

হুঁহ, আলসে লোকের কত যে বাহানা! সহেলি ঠোঁট বেঁকালেন, কুঁড়ের ডিম কোথাকার!

উৎসাহ দেখিয়ে কাজ পণ্ড করার চেয়ে কুঁড়ে হওয়া ঢের ভাল।

লাগসই জবাব দিতে যাচ্ছিলেন সহেলি, মিতিন তাড়াতাড়ি থামাল। সিটে বসে হাত ঝাড়তে ঝাড়তে বলল, অবনীদা, আপনার সেই কেরলাইট ছাত্র আসবে তো স্টেশনে?

অবশ্যই। অবনী মাথা দোলালেন, আমি বলেছি, আর সুনীল আসবে না এ কি হতে পারে? আমাকে সে অসম্ভব অ্যাডমায়ার করে।

দেখব ভক্তিশ্রদ্ধার নমুনা। সহেলি ফের ফোঁস করে উঠলেন, আমি কিন্তু তার সঙ্গে সারাক্ষণ হিন্দি-ইংরিজি চালাতে পারব না, আগে থাকতেই বলে দিচ্ছি।

আহা, কতবার তোমায় বলব নামে কেরলাইট হলেও সুনীল নালিয়াথ প্রায় বাঙালিই। ওর স্কুল কলেজ-ইউনিভার্সিটি সবই তো কলকাতায়।কেরলে চলে এসেছে তো মাত্র বছর পাঁচেক। ওর বাংলা শুনলে তোমার তাক লেগে যাবে।বলতে-বলতে মিতিনের দিকে ফিরলেন অবনী, জানো তো, কলেজে সুনীল একবার বাংলা নাটকে অভিনয় করেছিল।এলেবেলে রোল নয়, দাড়ি-গোঁফ লাগিয়ে একেবারে নরক গুলজারের ব্রহ্মা।

টুপুর হেসে ফেলল।কদিন ধরে অবিরাম সুনীল প্রশস্তি শুনছে বাবার মুখে।সুনীল কত গুণী, সুনীল কত নম্র, কত ভদ্র …।সুনীলের মতো মেধাবী ছাত্র নাকি কালেভদ্রে পাওয়া যায়। ইতিহাসের ছাত্র ছিল সে, দারুণ চোস্ত ইংরেজি লিখত, তার লেখা একটা ইংরেজি প্রবন্ধ পড়ে নাকি ডেকে চাকরি দিয়েছিল নামী সংবাদপত্র মর্নিং হেরাল্ড। কলকাতা ছেড়ে চলে এলেও এখনও সে কলকাতাকে ভোলেনি, নিয়মিত যোগাযোগ রাখে

পুরনো বন্ধুদের সঙ্গে, অধ্যাপকদের সঙ্গে।বিজয়া-নববর্ষে কার্ড তো পাঠায়ই, ফোনও করে মাঝেমধ্যে।

তা সেই সুনীল নালিয়াথের টুপিতে আর একটা পালক যোগ হল! বাংলা নাটকে অভিনয়! এ হেন সুনীলকে তো তা হলে দেখতেই হয়।

বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হল না।মিনিট দশেকের মধ্যেই এসে পড়ল এর্নাকুলাম জংশন।প্ল্যাটফর্মে নেমে টুপুররা জিনিসপত্র জড়ো করছে, হাঁপাতে-হাঁপাতে হাজির এক বছর তিরিশের যুবক।অবনীকে প্রণাম করে দুদিকে দুহাত মেলে দিল, ওয়েলকাম স্যার।ভগবানের নিজের দেশ কেরলে আপনাদের সুস্বাগতম।

অবনী প্রায় বিগলিত।খুশি-খুশি মুখে আলাপ করিয়ে দিলেন সকলের সঙ্গে।সহেলিকে প্রণাম করল সুনীল, পার্থর সঙ্গে করমর্দন, মিতিনকে হাত জোড় করে নমস্কার।টুপুরকে হাই, বুমবুমকে গাল টিপে হ্যালো।সাত বছর বয়স হয়েছে বুমবুমের, গাল টিপলে সে ভীষণ রেগে যায়, গোমড়া হয়ে অন্য দিকে মুখ ঘুরিয়ে নিল।

মিতিনের পরিচয় পেয়ে সুনীল বেজায় উচ্ছ্বসিত।কোনও মহিলা গোয়েন্দা সে নাকি এই প্রথম দেখছে।কম করে দশবার বলল, আমার কী সৌভাগ্য, আমার কী সৌভাগ্য ...।

সুনীলকেও প্রথম দর্শনে মোটামুটি পছন্দ হয়ে গেল টুপুরের।তবে খানিকটা নিরাশও হয়েছে।নাটকের ব্রহ্মার চেহারা আর একটু জবরদস্ত হবে বলে কল্পনা করেছিল।সুনীল রীতিমতো ছোটখাটো, রোগাযোগা, গায়ের রং শ্যামলাই বলা যায়, গলার স্বরও মোটেই গমগমে নয়, বরং মিহি-মিহি।তবে হ্যাঁ, সুনীলের মুখ-চোখ ভারী ঝকঝকে।বিশেষ করে চোখ।চশমার আড়ালে কালো মণিদুটো জ্বলজ্বল করছে।কথাবার্তার ধরনও খুব আন্তরিক, যেন তারা সবাই সুনীলের অনেক দিনের চেনা।

সদলবলে স্টেশনের বাইরে এল টুপুররা।সাতটা বাজে, তবে এখানে সন্ধে তেমন গাঢ় হয়নি।ভারতের পশ্চিম প্রান্তে সূর্য অনেকটা দেরিতে ডোবে, টুপুর জানে। রাস্তাঘাটের আলো অবশ্য জ্বলে গেছে, হ্যালোজেনের দ্যুতিতে উজ্জ্বল হয়ে আছে চত্বরটা।অক্টোবরের শেষ, তবে সমুদ্রের ধারে বলে বাতাসে আদৌ ঠান্ডা ভাব নেই।একটু যেন গরম-গরমই লাগছে।

সুনীল গাড়ি এনেছে।টাটা সুমো।একটু খেলিয়ে ছড়িয়েই বসল সকলে।পার্থ আর সুনীল ড্রাইভারের পাশে, পিছনে লটবহরসমেত বুমবুম আর টুপুর, বাকিরা মধ্যিখানে।সুনীলের নির্দেশে গাড়ি স্টার্ট দিল ড্রাইভার।

সিটে শরীর ছেড়ে দিয়ে অবনী বললেন, আমাদের জন্য হোটেল দেখে রেখেছ তো সুনীল?

আজ্ঞে, হ্যাঁ স্যার।সুনীল বাধ্য ছাত্রর মতো ঘাড় নাড়ল, দু তিনটে জায়গায় কথা বলে রেখেছি।আপনাদের যেটা পছন্দ হয় ...

কোথায় সেগুলো? কদ্দূর?

এর্নাকুলাম টাউন স্টেশনের কাছে।চিতুর রোডে।

আমরা কি এর্নাকুলামে থাকব? কোচিতে থাকব না?

স্যার, এর্নাকুলাম আর কোচিকে আমরা সেভাবে আলাদা করে দেখি না।সুনীল মৃদু হাসল, অবশ্য তফাত যে একেবারেই নেই, তা নয়।আরব সাগরের পাড়ে মেনল্যান্ডটা এর্নাকুলাম, আর খানদশেক দ্বীপ মিলিয়ে কোচি। তার মধ্যে বোলাঘাট্টি আইল্যান্ড আছে, ভাইপিন আছে, গুন্ডুদ্বীপ, নারাক্কাল...। সবচেয়ে বড় অবশ্য মাট্টানচেরি।মেনল্যান্ড-আইল্যান্ড সব মিলিয়েই এখন কোচি পৌরসভা।ডিস্ট্রিক্টের নাম এর্নাকুলাম।

মিতিন পিছন থেকে প্রশ্ন করল, উইলিংডন বলে আর একটা দ্বীপ আছে না? যেখানে কোচি স্টেশন? এয়ারপোর্ট? কোচি বন্দরও তো উইলিংডনে?

ওটা তো কৃত্রিম দ্বীপ ম্যাডাম।চারের দশকে কোচি বন্দরের নাব্যতা খুব কমে গিয়েছিল।বড় জাহাজটাহাজ ঢোকা নিয়ে সমস্যা হত।তখন রবার্ট ব্রিস্টো নামে এক সাহেব বন্দরের গভীরতা বাড়ানোর জন্য ড্রেজিং চালান।তাতে যে বিপুল পরিমাণ মাটি উঠেছিল, তাই দিয়েই তৈরি হয় উইলিংডন।সাইজ নেহাত ছোট নয় দ্বীপটার। প্রায় হাজার একর। ওই উইলিংডন তৈরি হয়েছিল বলেই ব্রিজ দিয়ে দিয়ে মেনল্যান্ড থেকে মাট্টানচেরি পর্যন্ত জুড়ে দেওয়া গেছে।তবে হোটেল বেশিরভাগই মেনল্যান্ডে।উইলিংডনের ওদিকে হোটেল খুব কস্টলি, সংখ্যাতেও তত বেশি নয়।থাকার পক্ষে তাই এদিকটাই ভাল।

সুনীল কথা বলে বেশ গুছিয়ে।বাংলা বেশ ঝরঝরে বটে, তবে একটা দক্ষিণী টানও রয়েছে।বাঙালিদের সঙ্গে এখন মেলামেশা কমে গেছে, হয়তো বা সেই জন্যই।সুনীল নালিয়াথের বক্তৃতা শুনতে শুনতে বাইরেটা দেখছিল টুপুর।শহরটা বেশ পরিচ্ছন্ন।চারদিকে ঝকমক করছে দোকানপাট।রাস্তা তেমন চওড়া নয়, তবে যথেষ্ট মসৃণ।কলকাতার মতো পদে-পদে ঝাঁকুনি খেতে হয় না।সবুজও চোখে পড়ে এদিকওদিক, মাঝে-মাঝেই নজরে আসে নারকেল গাছ, কলা গাছ।

হঠাৎই সুনীল বলল, আপনারা কিন্তু বড় কম দিনের জন্য কেরলে এলেন স্যার?

অবনীর বদলে পার্থ উত্তর দিল, উপায় নেই ভাই।কলকাতায় এই অধমের একটা ছোটখাটো ব্যবসা আছে। প্রেস।এক গাদা কাজ নিয়ে বসে আছি, কালীপুজোর আগে ফিরতে না পারলে কারবারে লাল বাতি জ্বলে যাবে।

তা বলে মাত্র এক সপ্তাহ?

উহুঁ, আট দিন।কাল সানডে টু নেক্সট সানডে তো আছিই।ট্রেনে উঠব আবার সেই সোমবার।

মাত্র আট দিনে কী দেখবেন? কেরল ছোট স্টেট ঠিকই, তবে এখানে পাহাড়-জঙ্গল-সমুদ্র সবই তো আছে। কতটুকু আপনারা কভার করতে পারবেন?

বেশি ঘোরাঘুরির দরকারই বা কী! অবনী বলে উঠলেন, দু-তিনদিন তোমার সঙ্গে কোচিতে থাকব, তারপর সোজা পাড়ি দেব কোভালাম।সেখান থেকে ফের কোচি হয়ে ব্যাক।

সে কী স্যার? কেরলে এসে মুন্নার পেরিয়ার কোথাও যাবেন না? নীলগিরি হিলস্ না ঘুরলে তো কেরলে বেড়ানোর অর্ধেক আনন্দই মাটি।তারপর আলেপ্পি কুইলন।

আলেপ্পিকে প্রাচ্যের ভেনিস বলে না? পার্থ ফুট কাটল, আলেপ্পিতে নাকি শহরের মধ্যে দিয়ে নৌকো চলে?

চলে তো।আলেপ্পির লেকে নৌকাবিহার একটা দারুণ এক্সপিরিয়েন্স।কুইলনেও আছে অষ্টমুড়ি লেক।সমুদ্রের ব্যাকওয়াটারে তৈরি এরকম ন্যাচারাল লেক কিন্তু আর কোথাও পাবেন না।

টুপুর পুট করে জিজ্ঞেস করে বসল, ব্যাকওয়াটারটা কী?

যে জলটা সমুদ্র থেকে এসে খাড়িতে আটকে থাকে কিম্বা যে জল ল্যান্ডে এসে রয়ে যায়।মিতিন ঘাড় ঘুরিয়ে বলল, কেরলে এই ব্যাকওয়াটার ব্যাপারটা খুব ইন্টারেস্টিং।কোথাও সে লেক, কোথাও সরু খালের মতো, সেখানে নৌকো বাওয়া হচ্ছে, লঞ্চ চলছে ...।

ইনফ্যাক্ট, কোচি থেকে কুইলন তো ব্যাকওয়াটার ধরে ধরেই চলে যাওয়া যায়।সুনীল সায় দিল, বিদেশিরা এই ভ্রমণটা খুব পছন্দ করে।একে বলা হয় ব্যাকওয়াটার ক্রুজ।এই ট্রিপ মিস।করলে কিন্তু স্যার আক্ষেপ থেকে যাবে।

বলছ?

হা স্যার।

তারপর ধরুন, আলেপ্পি কুইলনে সুন্দর সি বিচ আছে।ভারকালার বিচ তো দুর্দান্ত, ওরকম সূর্যাস্ত পৃথিবীতে কোথাও দেখা যায় না।

তুমি তো ভারী মুশকিলে ফেলে দিলে হে।তুমিই তা হলে একটা টুর প্ল্যান ছকে দাও।

এই তো স্যার, এতক্ষণে আপনি লাইনে এসেছেন।সুনীল হো হো হাসল।উল্লসিত মুখে বলল, সে আমি করে দেব।আপনারা গাড়ি নিয়ে ঘুরবেন তো?

হা, গাড়ি তো লাগবেই।কাঁহাতক বাসে-বাসে ট্যাঙোসট্যাঙোস করা যায়।আমার তো অন্তত পোষাবে না। এই বয়সে।

কথার মাঝেই টাটা সুমো থেমেছে এক হোটেলের দরজায়।চারতলা বাড়ি।মাথার উপর লাল-সবুজ আলোয় ঝিকমিক করছে। নাম, রেবতী ইন্টারন্যাশনাল। লাউঞ্জে পা রেখেই হোটেলটা মনে ধরে গেল সকলের। শ্বেতপাথরের মেঝে, দেওয়ালগুলো আয়নায় মোড়া, মাথার ওপর ঝুলছে পেল্লাই সাইজের ঝাড়বাতি, দামিদামি বেতের সোফা চমৎকার করে সাজানো, নানান রকম পাতাবাহারের টক শোভা পাচ্ছে চতুর্দিকে। রুম চার্জও খুব একটা বেশি নয়, মোটামুটি সাধ্যের মধ্যেই।পার্থ তবু দরাদরি না করে থাকতে পারে না, কেতাদুরস্ত রিসেপশন কাউন্টারের সুট-টাই পরা কর্মচারীটির সঙ্গে মিনিট আট দশ লড়ে আরও খানিকটা কমিয়ে ফেলল ভাড়া নেওয়া হল দুটো ঘর।একটাতে থাকবে সহেলি, মিতিন আর টুপুর, অন্যটায় বুমবুমকে নিয়ে পার্থ, অবনী।

রুমে ঢুকেই বুমবুমের দম শেষ।গাড়িতেই ঢুলছিল, তাকে টিভি চালিয়ে বসিয়ে দেওয়া হল কার্টুন চ্যানেলের সামনে, তবু সে ঘুমিয়ে পড়ছে।পার্থ পড়িমরি দৌড়ল তার খাওয়ার বন্দোবস্ত করতে।সহেলিও কাহিল, শুয়ে পড়লেন মরম গদিওয়ালা বিছানায়।সুনীলকে নিয়ে অবনীদের ঘরে এসে বসল মিতিন।পায়ে-পায়ে টুপুরও। বেয়ারাকে কফি দিতে বলা হয়েছিল, হুকুম করতে না করতে কফিপট হাজির।

টুপুর সবাইকে কফি ঢেলে দিল।মাপ করে দুধ মেশাল কাপে।চিনিও।তার এখন ক্লাস নাইন, এসব টুকিটাকি কাজ সে ভালই পারে।নিজেও এক কাপ কফি নিয়ে বসেছে বিছানায় আধশোওয়া অবনীর পাশটিতে।মিতিন আর সুনীল সোফায়।কথা বলছে টুকটাক।

কাপে চুমুক দিয়ে সুনীল বলল, তা হলে একটা কাজ করা যাক ম্যাডাম। কাল-পরশু দু দিন আপনারা কোচিতে থাকুন।আমি কালকের দিনটা ছুটি নিয়েই রেখেছি, পরশুটা ম্যানেজ করে নেব।যতটা পারি ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখিয়ে দেব আপনাদের। তারপর থার্ড ডে ভরে রওনা হয়ে যান মুন্নার। সেখানে একরাত থাকুন, পেরিয়ারে দু রাত, আলেপ্পিতে এক, কোভালামে এক।তারপর ফিরে কোচি থেকে ট্রেন ধরবেন।

মিতিন বলল, কিন্তু আমার দিদি যে কন্যাকুমারিকাতেও এক রাত থাকতে চায়। কোভালাম থেকে কন্যাকুমারিকা তো কাছেই, তাই না?

হু ঘণ্টা দুয়েক মতো লাগে।

তা হলে কোচিতে দুদিন না থেকে কন্যাকুমারিকাতেও যদি একটা রাত থাকতে পারি... কাল সারাদিনে কোচি ঘোরা হয়ে যাবে না?

পারবেন কি? বড় ধকল পড়বে।

কেন?

ধরুন, একবেলা কোচির দ্বীপগুলো দেখতে গেলেন....।সকাল নটার বোট ধরলেও ফিরতে-ফিরতে একটা-দেড়টা।তক্ষুনি কি আর মিউজিয়াম ছুটতে পারবেন? ভাবছিলাম বিকেলে আবার বটে করে আপনাদের সূর্যাস্ত দেখাতে নিয়ে যাব।সূর্য আরব সাগরে ডুবে যাচ্ছে, দৃশ্যটা কী অপূর্ব ভাবুন।তারপর সন্ধেবেলা কথাকলি নাচের প্রোগ্রাম দেখতে তো একবার যাওয়াই উচিত।ওটা কোচির অবশ্য-দর্শনীয় বস্তু।এ ছাড়া একটা হিল প্যালেস আছে, যেখানে কোচির রাজারা থাকতেন... ভাল পাখিরালয়ও আছে।একদিনে এত কিছু কী করে ম্যানেজ করবেন?

অবনী হাত নেড়ে বললেন, কাটছাঁট করো, কাটছাঁট করো। ওই দ্বীপটিপগুলো দেখা হলেই তো যথেষ্ট। ওগুলোর একটা হিস্টরিক্যাল ইম্পট্যান্স আছে।

নাচটা দেখবেন না স্যার? সুনীল ঈষৎ মনঃক্ষুন্ন যেন।

শরীর আর দিচ্ছে না, বুঝলে।টানা চুয়াল্লিশ ঘণ্টার ট্রেন জার্নি, এ কি মুখের কথা? কালকের দিনটা একটু হালকা-হালকা বেড়ানোই ভাল।এর সঙ্গে মিতিন যা বলছে, তাতে তো আবার পরশু ভোরেই যাত্রা।বড়িটাকে তার আগে একটু রেস্ট দিতে হবে না?

যা বলবেন স্যার।সুনীল মাথা নাড়ল, তা হলে কাল সকাল আটটার মধ্যে রেডি থাকুন, নটার বোটে আমরা সাইটসিয়িংএ বেরিয়ে পড়ব।

আটটা? অবনীর মুখ কাঁদো-কাঁদো, তোমাদের এখানে তো সাতটার সময়ে ভোর হয় সুনীল!

একটু দেরিতে হয়, তবে সাতটা নয় স্যার।ছটা-সাড়ে ছটা।আর নটার বোটে না গেলে সেই আবার দুটোয়। ফিরে তো আর সানসেট ট্রিপেও যেতে পারবেন না।

সুনীল...লক্ষ্মী ছেলে... তোমায় একটা অনুরোধ করব?

কী?

ওই দুটোর বোটটাই থাক।সমুদ্রে সূর্যাস্ত দেখে কী এমন হাত-পা গজাবে? ও আমি পুরীতে দেখেছি।

টুপুর আর থাকতে পারল না, বলে উঠল, পুরীতে সানসেট নয় বাবা, সানরাইজ দেখেছ।

ওই হল।দুটোরই তো রং এক।

দ্যাখো সিস্টার, আমার কিন্তু কোনও দোষ নেই।সুনীল হাত উলটে দিল, তোমার বাবার জন্যই কিন্তু তোমার সূর্যাস্ত দেখা হবে না।

তুমি আর ওকে উসকিয়োনা তো।যদি সময় থাকে, ফেরার পথে যখন কোচি আসব, তখন দেখে নেব।

পার্থ ঘরে এসেছে।কাঁধে ঘুমন্ত বুমবুম।তাকে খাটে শুইয়ে কালকের প্রোগ্রামটা শুনল পার্থ।সেও অবনীর সঙ্গে একমত।বেড়াতে এসে নাকি বেশি হুটোপাটি করতে নেই, একটু জিরিয়ে ঘোরাই ভাল।তা সে আটদিনের টুরই হোক, কি আশিদিনের।

অগত্যা হাল ছেড়েছে সুনীল।উঠে পড়ে বলল, বেশ, তাই হোক।আমি দুপুরেই আসব।কিন্তু আমার একটা অনুরোধ আপনাদের রাখতেই হবে।

সন্ধেবেলার কথাকলি নাচ?

সে গেলেন তো ভাল। না গেলেন, তো না গেলেন। তবে রাতে কিন্তু আমাদের বাড়িতে সবাইকে ডিনার করতেই হবে।আমার মা পইপই করে বলে দিয়েছেন।

এটা কি একটু বেশি অত্যাচার হয়ে যাবে না? অবনী অপ্রস্তুত। মুখে বললেন, ছ'টা লোক মিলে তোমাদের বাড়ি গিয়ে উপদ্রব করব?

কী বলছেন অবনীদা? ভূরিভোজের আমন্ত্রণ পেয়ে পার্থ যথারীতি আহ্লাদিত। চকচকে চোখে বলল, সুনীলের মা আদর করে খাওয়াতে চাইছেন, যাওয়া তো আমাদের কর্তব্য।আমরা অবশ্যই যাব সুনীল।

থ্যাঙ্ক ইউ।থ্যাঙ্ক ইউ।

ধন্যবাদ তো আমাদেরই দেওয়া উচিত। এত দূরে এসে একটা নেমন্তন্ন জুটে গেল...। পার্থ গুছিয়ে বসল, তবে ভাই, আমার দুটো জিজ্ঞাস্য আছে।

কী দাদা?

এক, তোমরা কি নারকোল তেলে রান্না করো?

না দাদা, আমরা বাদাম তেল খাই। সত্যি বলতে কী, আমাদের এখানে এখন বাদাম তেলেরই চল বেশি। বিশেষ করে শহরে।

গুড।দুনম্বর প্রশ্ন, তোমরা কি ভেজিটেরিয়ান?

পাক্কা ননভেজ। সুনীল হেসে ফেলল, আমরা আপনাদের মতোই মৎস্যভুক দাদা। শুধু সমুদ্রের মাছ একটু বেশি খাই, এই যা।তবে কাল আপনাদের জন্য মিঠে জলের মাছই থাকবে।

আমার সব চলে।আর চিংড়ি হলে মিঠে জলেরই বা কী, নোনা জলেরই বা কী!

সুনীলের হাসি আরও চওড়া হল, আপনার জন্য চিংড়িই থাকবে দাদা।

অতি উত্তম।যাও, আজকেই গিয়ে তোমার মাকে আমার প্রণাম জানিয়ে দাও।

আমার মা বাঙালি খানাটাও খুব ভাল বানান।কম দিন তো কলকাতায় ছিলাম না আমরা, প্রায় ষোলো বছর। বাবা রিটায়ার করে চলে এসেছেন, কিন্তু এখনও পোস্ত খাওয়াটা ভোলেননি। মাঝে মাঝেই মা ঝাল-ঝাল আলুপোস্ত রান্না করেন।

বাহ, বাহ।কাল তা হলে একটু আলুপোস্তও রেখো।

বেশ, তাও থাকবে।সুনীল হাসতে হাসতে ঘড়ি দেখল, আজ তা হলে আসি।আপনারা টায়ার্ড আছেন, বিশ্রাম করুন।কাল ঠিক দুপুর একটায় আমি হাজিরা দেব।

সুনীল চলে যেতেই টুপুর চোখ পাকিয়েছে, তুমি কী হেংলু গো পার্থমেসো! এভাবে কেউ খাওয়ার কথা বলে?

অন্যায়টা কী আছে? গিয়ে খাবার দেখে নাক সিঁটকোবি, ফিরে এসে নিন্দে করবি, তার চেয়ে আগেই খোলাখুলি কথা হয়ে যাওয়া ভাল নয়? ও বেচারারও আর মেনু নিয়ে কোনও টেনশন থাকল।না।

মিতিনের মুখে চাপা হাসি।বলল, এক দিক দিয়ে তোর মেসো অবশ্য ঠিকই করেছে।পেটে খিদে মুখে লাজ করে তো আমরা অনেক সময়েই ঠকি।তোর মেসোর মুখে যখন দক্ষিণী খানা রোচেই না...

আমার কিন্তু ভালই লাগে।

সে তো আমারও।একদিন কেরলিয়ান ডিশ খেলে একটু অন্য রকম স্বাদও পেতাম।

অবনী বলে উঠলেন, এবার খাওয়ার গল্প একটু থামাবে? যাও, মাসি-বোনঝি এখন কেটে পড়ো তো।ঘরে গিয়ে ফ্রেশ হও।আমি আর পার্থ ততক্ষণ একটু মাথা ছাড়াই।

এখন আপনারা দাবা নিয়ে বসবেন? মিতিন ভুরু কুঁচকোল, ট্রেনে চুয়াল্লিশ ঘণ্টার মধ্যে অন্তত আঠারো ঘণ্টা দাবা খেলেছেন, তাও আশ মিটল না?

দানটা শেষ হয়নি যে। এখনও পার্থর একটা গজ, একটা নৌকো, একটা ঘোড়া জীবিত। আমার একটা নৌকো, দুটো গজ।

পার্থ বলল, বোড়েও আছে আমাদের তিনটে করে।এখনও যে কেউ জিততে পারি।

টুপুর মিতিনমাসির দিকে তাকিয়ে কাঁধ ঝাঁকাল। সত্যি, বাবা আর পার্থমেসো পারেও বটে। এবার বেড়াতে বেরনোর সময়ে বাবাকে মোটা-মোটা বই নিতে দেওয়া হয়নি, তাই প্রতিশোধ নেওয়ার জন্যই যেন বাবা মেতে আছে ওই চৌষট্টি ঘরের খেলায়। প্রথম গেম শুরু হয়েছিল হাওড়া ছাড়ার পরপরই, এখনও চলছে সেটাই। খেলার সময়ে দুজনেরই বাহ্যজ্ঞান লোপ পায়, ডেকে-ডেকে সাড়া পাওয়া যায় না। বাবা তখন ক্রামনিক, তো পার্থমেসো কাসপারভ।একটা চাল দিতে দেড় ঘণ্টা, দুঘণ্টা পর্যন্ত সময় লেগে যায়।আবার চাল দেওয়া মাত্রই তা ফেরত নেওয়ার জন্য বায়না জুড়ে দেয় দুজনে।জোর তর্ক বাধে তখন, দুজনেই মুঠো পাকায়, গরগর করেসে এক দৃশ্য বটে।এবার গোটা ভ্রমণে দুজনে ওই একই গেম চালাবে বলে মনে হয়।

অবনী শয্যা ছেড়েছেন। টেবিলের কাছে গিয়ে লাল কিটব্যাগ খুললেন। হাতড়াচ্ছেন। বিস্ময়ের সুরে বলে উঠলেন, কী ব্যাপার, দাবার বোর্ডটা গেল কোথায়? এখানেই তো রেখেছিলাম।

পার্থ হেসে বলল, ও অবনীদা, ওটা তো আমার ব্যাগ।আপনারটা তো কাবার্ডে।

বলতে বলতে গিয়ে অবনীর কিটসব্যাগখানা বের করেছে পার্থ।দুটো ব্যাগই হুবহু এক।রং, সাইজ, এমনকী মনোগ্রামটাও দুটো টিশার্টের সঙ্গে একটা ব্যাগ ফ্রি দিচ্ছিল বলে চার-চারখানা টি-শার্ট কিনে ফেলেছিল পার্থ, একটা ব্যাগ উপহার দিয়েছে অবনীকে। এবং দুজনেই মাঝে-মাঝে ব্যাগ গুলিয়ে ফেলছে। ক্যামেরা বার করতে গিয়ে অবনীর ছাতা টানছে পার্থ, নিজের টুথব্রাশ ভেবে পার্থর টুথব্রাশে দাঁত মেজে আসছেন অবনী। কেলোর কীর্তি আর কাকে বলে!

ফোল্ডিং বোর্ড বের করে দুই ভায়রাভাই নেমে পড়েছেন রণক্ষেত্রে।মিতিন চলে গেল পাশের ঘরে।টুপুরও উঠল।যেতে গিয়ে আর একবার চোখ পড়ল ব্যাগ দুটোয়।

ফিক করে হেসে ফেলল টুপুর।যমজ ব্যাগ নিয়ে একটা রহস্য কাহিনী ফাঁদলে কেমন হয়? দারুণ জমে যাবে কিন্তু গল্পটা!

.

০২.

সি-লর্ড জেটি থেকে মোটরবোট ছাড়ল দুটো পাঁচে।জনাসত্তর যাত্রী নিয়ে তিরতির জল কেটে-কেটে চলেছে আরব সাগর অভিমুখে।দেখতে দেখতে দূরে সরে গেল এর্নাকুলাম।

জলযানটিতে বসার ব্যবস্থা অতি চমৎকার। ডেকে খানচল্লিশেক চেয়ার, নীচের খোলেও বসতে পারে

জনাপঞ্চাশ-ষাট।খোল মানে বদ্ধ কিছু নয়, চতুর্দিকে জানলা, প্রকৃতি দর্শনে কোনও অসুবিধে নেই।হুহু হাওয়া বইলেও রোদ্র আজ বড় চড়া, তাত এড়াতে বেশিরভাগ যাত্রীই ভিড় করেছেনীচের তলায়। এক কেরলীয় গাইড হাত-মুখ নেড়ে বর্ণনা দিচ্ছে যাত্রাপথের। ভাষাটা ইংরেজি, তবে উচ্চারণের গুণে তামিল-মলয়ালম বলেও চালিয়ে দেওয়া যায়।

একটি বর্ণও বোধগম্য হচ্ছিল না টুপুরের।উশখুশ করছিল।টের পেয়ে সুনীল বলল, কী সিস্টার, ওপরে যাবে নাকি?

বুমবুম তো একপায়ে খাড়া।শুনেই নাচছে, চলো না।চলো না, প্লিজ।

সহেলি জানলার ধারে গুছিয়ে বসেছেন।বললেন, আমি বাপু ছায়া ছেড়ে নড়ছি না।

অবনী বললেন, আমিও এখানে দিব্যি আছি।ফুরফুরে হাওয়া খাচ্ছি।

এক কাজ করো।তোমার ছাতাটা ওদের বের করে দাও।একটু তো রোদ আটকাবে।অবনীর লাল ব্যাগখানা আনা হয়েছে সঙ্গে।তাতে কী আছে আর কী নেই! চিপস, চানাচুর, ফুটকেক, বিস্কুট, ডজনখানেক কলা, লাড্ডু, বড় বোতলে জল, ঢাউস কোল্ড ড্রিংক, ঘাম মোছার তোয়ালে, ছাতা, টর্চ, এমনকী পেতে বসার খবরের কাগজও।

মিতিন ব্যাগ খুলে শুধু কোল্ড ড্রিংকের বোলটা তুলে নিল।বলল, এই উথালপাথাল হাওয়ায় ছাতা খোলা যাবে না দিদি।বুমবুমকে তা হলে বেতের টুপিটা অন্তত পরিয়ে দে।

বুমবুমের তর সইছে না।কোনওরকমে টুপি চড়িয়ে টুপুর সুনীলের সঙ্গে লাফাতে লাফাতে চলে গেল উপরে। প্রখর উত্তাপে জনাদশ-বারো যাত্রী রয়েছে ডেকে।বেশিরভাগই বিদেশি।দামি ক্যামেরায় সাহেব-মেমসাহেব ছবি তুলছে পটাপট।পার্থমেসোও ক্যামেরা কাঁধে উঠে এল দোতলায়।রেলিং-এর ধারে দাঁড়িয়ে প্রাকৃতিক দৃশ্য ফোকাস করছে।বুমবুম উত্তেজিত মুখে নির্দেশ দিচ্ছে বাবাকে।

মিতিন আর টুপুর দুজনের পরনেই আজ সালোয়ার কামিজ। রোদ বাঁচাতে ওড়নায় মাথা ঢাকল টুপুর। মিতিনকে জিজ্ঞেস করল, ডান দিকে ওটা কী আইল্যান্ড গো?

বোলঘাট্টি।সুনীল উত্তর দিল, ওখানে যে সাদা মতন বাড়িটা দেখছ, ওটা একটা ডাচ প্যালেস।এখন অবশ্য হোটেল।ওই দ্বীপে একটা গলফ খেলার মাঠও আছে।শীতকালে অনেকে পিকনিক করতে যায় বোলঘাট্টিতে।

আমরা কি ওই ডাচ প্যালেসটাই দেখতে যাচ্ছি?

না না।সেটা তো মাট্টানচেরিতে।সেই প্যালেসের হিস্ট্রি ভারী অদ্ভুত।ডাচ, মানে ওলন্দাজরা মোটেই ওটা তৈরি করেনি।প্রাসাদটা আদতে পর্তুগিজদের বানানো।

এদিকে ডাচ প্যালেস নাম, ওদিকে বানিয়েছে পর্তুগিজ?

ইয়েস সিস্টার।যে সব পর্তুগিজ আমাদের দেশে এসেছিল, তারা বেশিরভাগই তো সুবিধের লোক ছিল না। হয় ছিল জলদস্যু, নয় লুঠেরা, খুনে।তা ওইরকমই এক বজ্জাত পর্তুগিজ একটা হিন্দু।মন্দিরে লুঠপাট চালিয়েছিল।খবর পেয়ে কোচির রাজা তো চটে লাল।তখন রাজাকে শান্ত করার জন্য পর্তুগিজরা আস্ত একখানা।প্রাসাদ তৈরি করে রাজাকে উপহার দেয়।প্রায় সাড়ে চারশো বছর।আগে।পনেরোশো পঞ্চান্ন সালে।কোচি তখন ছিল পর্তুগিজদের কলোনি।শখানেক বছর পর ডাচরা এসে পর্তুগিজদের হঠিয়ে দেয় এবং সুন্দর করে সাজিয়ে গুছিয়ে আবার তারা এই প্রাসাদ ভেট দেয় কোচিরাজকে।

তার মানে একই প্যালেস দুবার উপহার দেওয়া হল?

হল।রাজাকে সন্তুষ্ট করতে ডাচরাও মরিয়া ছিল যে!

গল্পে-গল্পে এগোচ্ছে মোটরবোট। বাঁয়ে এবার উইলিংডন দ্বীপ। জলের ধারে অতিকায় এক হোটেল। বিলাসবহুল হোটেলটা দেখে টুপুরের একটু আপশোশ হল মনে-মনে।ইস, ওই হোটেলেই তো তারা উঠতে পারত! দূরে আরব সাগর দেখা যাচ্ছে, হোটেলে বসে সারাদিন বেশ তাকিয়ে থাকত সমুদ্রের দিকে।

উইলিংডন পেরিয়ে, থইথই ব্যাকওয়াটার ছেড়ে মোটরবোট ঘুরল বাঁয়ে। অপেক্ষাকৃত সরু খাঁড়িতে। মিনিট পাঁচ-সাতের মধ্যেই এসে পড়ল মাট্টানচেরির ফেরিঘাট।এখানেই প্রথম বিরতি, এক ঘণ্টা থামবে বোট।

ঘাট থেকে মাট্টানচেরির ডাচ প্যালেস খুব একটা দূরে নয়।পৌঁছে টুপুর হতাশই হল বেশ।প্রাসাদের চেহারাটা যেন কেমনকেমন। দেখে মনে হয় নিতান্তই সাধারণ এক দোতলা বাড়ি। উঁচু পাঁচিলে ঘেরা। যতই বড়সড় হোক, বাড়িটার আভিজাত্যও নেই, জলুসও নেই।

বড় লোহার গেটখানা বন্ধ।লোহার গেটের মধ্যিখানে খুদে।একখানা দরজা, সেখান দিয়েই গলে-গলে ঢুকছে টুরিস্টরা।প্রাসাদের একটা অংশ নিয়ে মিউজিয়াম।দেখতে হলে উঠতে হয় দোতলায়, উঁচু-উঁচু সিঁড়ি ভেঙে।

কোনওক্রমে উঠলেন সহেলি। হাঁপাচ্ছেন। জিরোচ্ছেন। টুপুররা দল বেঁধে ঢুকে পড়ল অন্দরে। প্রথম ঘরে দেওয়াল জোড়া প্রকাণ্ডপ্রকাণ্ড মিউরাল পেন্টিং।নিপুণ হাতে আঁকা রামায়ণ মহাভারতের কাহিনী।দেওয়ালের গায়ে কাঠের কাজও তারিফ করার মতো। বাকি দু-তিনটে ঘরে রাজারাজড়াদের পোশাক, অস্ত্রশস্ত্র, চোখ ধাঁধানো কারুকাজ করা পালকি, পুরনো আমলের দলিল দস্তাবেজ। অবনী অনেকটা সময় নিয়ে চোখ বোলালেন দলিলগুলোয়। এই প্রাসাদেই নাকি অভিষেক হত কোচিরাজার, ছোট-বড় রাজসিংহাসনও সংরক্ষিত আছে প্রাসাদে। বুমবুম দড়ির বেড়া টপকে সিংহাসনে বসে পড়তে যাচ্ছিল, টুপুর খপ করে ধরে ফেলল তাকে।মিতিনমাসির সঙ্গে অন্ধকার সিঁড়ি বেয়ে নীচের মিউজিয়ামও দেখে এল টুপুর।আলাদা করে বিশেষ কিছু দেখার নেই সেখানে।সেই একই ধরনের রাজপোশাক, ঢাল-তলোয়ার, নয়তো কিছু কাগজপত্র।

প্রথম ঘরটা দেখেই নেমে এসেছিলেন সহেলি।নীচের ধাপিতে বসে জল খাচ্ছেন ঢকক। পার্থর মুখও ঈষৎ বেজার।মিউজিয়ামে ফ্ল্যাশগান জ্বালানো মানা বলে একটা ছবি তুলতে পারেনি বেচারা।একমাত্র অবনীই যা তৃপ্ত।এই ধরনের ঐতিহাসিক স্থান তাঁর বড় প্রিয়।

এবার যাত্রা ইহুদিদের সিনাগগের দিকে।ডাচ প্যালেস থেকেই দেখা যাচ্ছিল সিনাগগের চূড়া, মনে হচ্ছিল যেন পাশেই, কিন্তু যেতে হল বেশ খানিক ঘুরে।রাস্তায় পড়ল কোচির মশলাপট্টি।কেরলের ভুবন বিখ্যাত এলাচ, লবঙ্গ, দারচিনি, গোলমরিচ নাকি নিলাম হয় এই বাজারে।আজ রবিবার, নিলামখানা বন্ধ, পাড়াটাও তাই ফাঁকাফাঁকা।

নিলামখানার গায়েই সরু গলি।জু টাউন।দুধারটা দেখতে দেখতে হাঁটছিল টুপুর।ইহুদিপল্লীর বাড়িগুলো অতি প্রাচীন। সুদূর অতীতের গন্ধ যেন লেগে আছে গায়ে। এদিক-ওদিক বেশ কয়েকটা দরজির দোকান, আর কিউরিয়ো শপ। ভ্রমণার্থীদের জন্য খোলা আছে দুর্লভ শিল্পবস্তুর দোকানগুলো, কেনা-বেচা চলছে অল্পবিস্তর।

সহেলি একটা দোকানে দাঁড়িয়ে পড়েছেন।চেঁচিয়ে ডাকলেন, এই মিতিন, দেখবি আয়।

সুনীলের সঙ্গে কথা বলতে বলতে এগিয়ে গিয়েছিল মিতিন।ফিরে এল, কী হল?

পেতলের ঘণ্টাটা কী সুন্দর দ্যাখ! নিয়ে নেব নাকি?

কী করবে নিয়ে?

কেরল টুরের স্মৃতি হিসেবে রাখব। ড্রয়িংরুমের পরদাতেও লাগিয়ে দিতে পারি। পরদা নড়লেই ঢং করে বাজবে।কিম্বা গিফটও করা যায় কাউকে।

টুপুর দুদিকে মাথা নাড়ল।নাহ্, বেড়াতে বেরিয়ে মার বাজার করার বাতিকটা আর গেল না।

সহেলির আগ্রহ টের পেয়ে দোকানদারও উদ্দীপিত।হাত-মুখ নেড়ে বলল, নিয়ে নিন ম্যাডাম।এ সত্যিই অতি দুষ্প্রাপ্য বস্তু। আপনি নিশ্চয়ই এজেকিয়াল রাহাবির নাম শুনেছেন? ওই যে সিনাগগের মাথায় বড় ঘড়িটা দেখছেন, ওটা যিনি তৈরি করিয়েছিলেন। এই ঘণ্টাও সেই রাহাবিরই সম্পত্তি।আপনি যদি নেন, তো জলের দরে দিয়ে দেব।আড়াইশো বছরের পুরনো ঘণ্টা পাবেন মাত্র আড়াই হাজার টাকায়।

মিতিন ফিসফিস করে বলল, কথায় ভুলো না।ঘণ্টাটার বয়স এক বছরও হয়েছে কিনা সন্দেহ।ওটা যেখান থেকে কিনেছে, সেখানকার দামের ট্যাগ সাঁটা ছিল গায়ে। ছিঁড়ে ফেললেও ছাপানো কাগজের কুচি কিন্তু এখনও ঘণ্টায় লেগে আছে।

সুনীলও নিচু গলায় বলল, এরা কিন্তু খুব ঠকায় ম্যাডাম।ঠিকঠাক না চিনে কেনা কিন্তু উচিত হবে না।অগত্যা সহেলিকে নড়তেই হয়। জুলজুল চোখে বাহারি ঘণ্টাটাকে আর একবার দেখে নিয়ে এগোলেন সহেলি। পঁচিশতিরিশ হাত গিয়েই সিনাগগ। ইহুদিদের উপাসনালয়। বহিরঙ্গে তেমন পারিপাট্য নেই বটে, তবে প্রাচীনত্ব বেশ বোঝা যায়।রাহাবির ঘড়িটি ভালই সময় দিচ্ছে।তিনটে কুড়ি।

টিকিট কেটে, জুতো ছেড়ে, সিনাগগে ঢুকেই চক্ষু ছানাবড়া।ভিতরে রঙের কী বাহার! ঝলমল ঝলমল করছে! সহেলি পর্যন্ত ঘণ্টার শোক ভুলে বিমোহিত।দর্শনার্থীদের ভিড়ে এমনিই গিজগিজ করছিল চারদিক, টুপুরদের মোটরবোটের দলটা ঢুকে ঠাঁই নাই ঠাঁই নাই দশা।তার মধ্যেই সব্বাইকে এক জায়গায় জড়ো করেছে গাইড। গড় গড় আউড়ে চলেছে সিনাগগবৃত্তান্ত।সেই দুর্বোধ্য ইংরেজিতে।

টুপুর, মিতিন সরে এল।সুনীলের মতো গাইড থাকতে তারা ওই লোকটার বকবকানি শুনবে কেন।

গলা ঝেড়ে সুনীল বলল, এই সিনাগগ আর ওই ডাচ প্যালেস মোটামুটি সমসাময়িক। এটা তৈরি হয়েছে পনেরোশো আটষট্টিতে। আমাদের কোচির রাজা ভাস্কর প্রথম রবি বর্মা জমিটা দান করেছিলেন ইহুদিদের। ওই দেওয়ালে গাঁথা তামার পাত দেখছেন, ওটাই দানপত্র।

টুপুর জিজ্ঞেস করল, কিন্তু ইহুদিরা কোচিতে এল কী করে?

সে এক লম্বা স্টোরি।পরে শুনিসখন।মিতিন বলল, এখন ভাল করে সিনাগগটা দ্যাখ।

পার্থ প্রাণ ভরে ছবি তুলছিল।কাছে এসে আঙুলে তারিফের মুদ্রা ফুটিয়ে বলল, দেখার মতো জায়গা বটে।কী ঘ্যামচ্যাক সব ঝাড়লণ্ঠন, বাপস্!

আর কত ধরনের ল্যাম্প! গা দিয়ে যেন রামধনুর রং ঠিকরোচ্ছে!

মাঝখানে পেতলের রেলিংওয়ালা গোল জায়গাটা কীসের?

বুঝতে পারলে না? ওখানে দাঁড়িয়ে রাবি প্রার্থনা করেন।

রাবি মানে তো ইহুদিদের পুরোহিত, তাই না মিতিনমাসি?

কারেক্ট।সুনীল হাসল, আর ওপরে যে ঘেরা ব্যালকনি, ওখানে লাইন দিয়ে দাঁড়ান ভক্তরা।

বুমবুম বিজ্ঞের মতো মেঝের টাইলস পরিদর্শন করছিল।গম্ভীর গলায় প্রশ্ন করল, এই সব রঙিন পাথর কি

ইহুদিদের বানানো?

উহুঁ। এই টাইলস আনা হয়েছিল চিন দেশের ক্যান্টন থেকে। ওই যে রাহাবির কথা হচ্ছিল, উনিই আনিয়েছিলেন।টাইলসের উপর নকশাগুলো হাতে আঁকা।চিনাদেরই।

অবনী আর সহেলি দক্ষিণী গাইডের বক্তৃতা শুনছিলেন এতক্ষণ।অবনী হঠাৎ এসে জিজ্ঞেস করলেন, এখানে নাকি একটা দারুণ ইন্টারেস্টিং জিনিস আছে সুনীল?

কী বলুন তো স্যার?

গ্রেট স্ক্রল।

ও হ্যাঁ, ওটার কথা তো বলাই হয়নি।ছাগলের চামড়ার ওপর লেখা একটা ওল্ড টেস্টামেন্ট আছে এখানে।হিব্রু লিপিতে।

তাই নাকি? মিতিন অবাক, পুরো ধর্মগ্রন্থ ছাগলের চামড়ায় লেখা?

ইহুদিদের ধর্মগ্রন্থ তো তালমাদ।তার গোটাটাই আছে কিনা বলতে পারব না ম্যাডাম।তবে আমার এক জু বন্ধু ছিল, তার মুখে শুনেছি, ওদের পবিত্র টোরা, মানে ধর্মীয় অনুশাসনলিপি নাকি রাখা থাকে সিনাগগের দেওয়ালসিন্দুকে।

অনুশাসন মানে কি টেন কমান্ডমেন্টস? অর্থাৎ সিনাই পর্বতে মোজেস যে দৈববাণী পেয়েছিলেন...?

দৈববাণীর গল্পটা জানে টুপুর।সিসিল বি ডি মিলির তৈরি দারুণ জমকালো টেন কমান্ডমেন্টস সিনেমাটা মাত্র কমাস আগে দেখেছে।সে।নন্দনে একটা বিশেষ শো হয়েছিল, নিয়ে গিয়েছিল স্কুল থেকে।ছবিতে সমুদ্র দুভাগ হয়ে যাওয়ার দৃশ্যটা ভাবলে এখনও টুপুরের গায়ে কটা দেয়।

অবনী উৎসুক স্বরে জিজ্ঞেস করলেন, ওই গ্রেট স্ক্রল একবার দেখা যায় না সুনীল?

আমি যতদূর জানি, স্যাবাথের দিন ছাড়া ওটা বের করা হয় না স্যার।মানে শনিবার।যেদিন এঁরা প্রার্থনা-টার্থনা করেন।

দ্যাখো না একবার চেষ্টা করে।তুমি তো প্রেসের লোক, তুমি রিকোয়েস্ট করলে হয়তো...

দেখছি।

গুরুর অনুরোধ রক্ষা করতে কোথায় যেন গেল সুনীল।মিনিট দশেক পর ফিরে এসে বলল, এমনিতে ওঁরা কাউকে দেখান না।অনেক বলে কয়ে ম্যানেজ করলাম।তবে...

কী হবে?

ছটার সময়ে আসতে হবে।সিনাগগে ভিজিটিং আওয়ার শেষ হওয়ার পর।সিনাগগ দেখাশুনো করে একটা ট্রাস্টি বোর্ড।ওই ট্রাস্টি বোর্ডেরই এক সদস্য সিনাগগের কেয়ারটেকার।পাশেই বাড়ি।তিনি বললেন, রাবিকে বলে তখন একটা ব্যবস্থা করতে পারেন।

বাহ।খুব ভাল।এতে সমস্যা কোথায়?

আমাদের মোটরবোট যে চলে যাবে স্যার।তা ছাড়া আরও কিছু সাইটসিয়িং আছে..

মিতিন বলল, আমরা যদি বোটে না ফিরি? এখান থেকে তো ট্যাক্সি নিয়ে যাওয়া যায়? ব্রিজ ক্রস করে?

তা অবশ্য যায়।মোটরবোট তো এর পর মাট্টানচেরিরই আর একটা ঘাটে যাবে, ওখানেই না হয় আমরা পাকাপাকি নেমে যাব।কী, তাই করবেন?

সবাই এক বাক্যে রাজি।একমাত্র সহেলিই যা সামান্য গাঁইগুই করছিলেন।হোটেলে ফিরে, সুনীলদের বাড়ি যাওয়ার আগে, তাঁর টুকটাক মার্কেটিং-এর বাসনা ছিল।সন্ধে অবধি মাট্টানচেরিতে পড়ে থাকলে তা কি আর হবে।

তা যাই হোক, দলের সঙ্গে বেরোলে কিছু সমঝোতা তো করতেই হয়।কেয়ারটেকারকে জানিয়ে মোটরবোটে এল টুপুররা। পরবর্তী ফেরিঘাটে নেমে সাইকেল রিকশা ধরে সোজা সেন্ট ফ্রান্সিস চার্চ। ভারতে ইউরোপিয়ানদের তৈরি প্রথম গির্জা।

জানাই ছিল আজ রবিবার, টুরিস্টদের জন্য গির্জা বন্ধ। তবে এসেছে যখন, জায়গাটা তো দেখতেই হয়। ভাস্কো-দা-গামার সমাধিস্থল বলে কথা!

গির্জায় পৌঁছে টুপুর অবশ্য বেজায় হতাশ। ভাস্কো-দা-গামার সমাধির জায়গাটাও গির্জার ভিতরে। অতএব সেটা দেখারও কোনও সুযোগ নেই।

পার্থ ঠোঁট উলটে বলল, স্যাবাথ ডে-তে গির্জায় আসার ঠেলা বোঝ।পুরো জার্নিটাই বেকার।

বুমবুম ভুরু কুঁচকে বলল, স্যাবাথ ডে মানে কী বাবা?

বিশ্রামের দিন।খ্রিস্টান আর ইহুদিরা বিশ্বাস করেন, ভগবান পৃথিবীটাকে গড়েছিলেন ছদিনে।ব্যাপক খাটুনি গেছিল তো, তাই সপ্তম দিনে তিনি বিশ্রাম নিয়েছিলেন।ভগবানের দেখাদেখি ভক্তরাও তাই সপ্তাহে একটা দিন বিশ্রাম নেয়। সেদিন নো কাজ। একমাত্র প্রার্থনা ছাড়া। ইহুদিরা শনিবারটাকে স্যাবাথ বলে মানেন, খ্রিস্টানরা রবিবার।

বুমবুম আরও গম্ভীর হয়ে বলল, আমিও খ্রিস্টান হয়ে যাব। তা। হলে কেউ আমায় রোববার পড়তে বসতে বলতে পারবে না।

হুহ।বাকি ছদিন তুমি পড়ে যেন উলটে যাচ্ছ।

আমি উলটোই না।সোজাই থাকি।

বুমবুমের কথার ভঙ্গিতে হা-হা হেসে উঠল সবাই।কাগজ পেতে একে-একে বসে পড়েছে গির্জার সামনেটায়। বোটে ফেরার তাড়া নেই, এখন মনের সুখে গুলতানি চলতে পারে ঘণ্টাখানেক।ব্যাগ থেকে বেরিয়ে পড়ল খাবারদাবার।একটু-আধটু মুখ চলছে সকলেরই।

টুপুরেরই শুধু মন খারাপটা কাটছিল না।আনমনে দেখছিল গির্জাটাকে।বিকেলের সূর্য এসে পড়েছে গির্জার মাথায়।সোনালি আলোয় কী ঝকঝক করছে সখানা।আহা, আজ রবিবার না হলে সত্যিই খুব ভাল হত।

বিড়বিড় করে টুপুর বলেই ফেলল, এত দূর এসেও ভাস্কো-দা-গামার সমাধিটা মিস হয়ে গেল! কোনও মানে হয়?

সমাধি আর এখানে কোথায় টুপুর? মিতিন সান্ত্বনা দিল, ভাস্কো-দা-গামা মারা গিয়েছিলেন পনেরোশো চব্বিশে। তার চোদ্দো বছর পরেই তো কফিন এখান থেকে তুলে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল লিসবনের বেলেম কনভেন্টে।

সুনীল বলল, ইয়েস সিস্টার।এখানে শুধু জায়গাটাকে ঘিরে রাখা আছে।ভেতরে কিছু নেই।

তা হোক, এক সময়ে তো ছিল।ভাস্কো-দা-গামার মতো একজন বিখ্যাত ভূপর্যটক

ভুল বললি টুপুর। ভাস্কো-দা-গামা মোটেই ভূপর্যটক নন। অবনী মেয়েকে শুধরে দিলেন, ভাস্কো-দা-গামা ছিলেন পাক্কা বিজনেসম্যান।কোচিতে এসে তিনি একটা ফ্যাক্টরিও করেছিলেন।জাহাজ-জাহাজ মশলা চালান দিতেন এখান থেকে।

দেখতে দেখতে কেটে গেল সময়।ফাঁকে ফাঁকে লাল ব্যাগের খাবারও শেষ।পাঁচটা নাগাদ উঠে পড়ল সবাই। এবার গুটিগুটি যাওয়া যাক সিনাগগে।

ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্য সাইমন পেরেজ বাড়িতেই অপেক্ষা করছিলেন। বছর ষাটেকের মানুষটার চেহারাটা দেখার মতো। পেটা স্বাস্থ্য, হাইট প্রায় ছফুট, কাটাকাটা নাক, চোখ, গায়ের রং দেখে বোঝার উপায় নেই ভারতীয় না বিদেশি।রোদে পুড়ে ঈষৎ তামাটে ভাব এসেছে বটে, তাও দারুণ ফরসা।

সুনীলকে দেখে সাইমন বললেন, তাড়াতাড়ি এসে ভালই করেছ। তোমাদের কাজটা সেরে আমি একবার মেনল্যান্ডে যাব।কোট্টায়াম থেকে আমার এক বন্ধুর আসার কথা আছে।

সুনীল জিজ্ঞেস করল, আপনিই দেখাবেন তা হলে?

না না।ওটা তো রাবির দায়িত্ব।আমি সঙ্গে থাকব।চলো , আমরা আগে রাবির কাছে যাই।

সিনাগগের রাবি জোস হ্যালেগুয়া থাকেন জু টাউনে, গলিতে।আদ্যিকালের বাড়িটার সদর খোলাই ছিল, এক স্যাঁতসেঁতে অন্ধকার-অন্ধকার ঘরে টুপুরদের বসালেন সাইমন।প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই অন্দরমহল থেকে এক বৃদ্ধ দম্পতির আবির্ভাব। বয়স্ক মানুষটি ভারী সৌম্যকান্তি। টকটকে রং, মুখময় সাদা দাড়ি, চোখে সোনালি ফ্রেমের চশমা।তুলনায় মহিলা ছোটখাটো।পরনে লং স্কার্ট, পাকা চুল চুড়ো করে বাঁধা।

ঘরে টিউবলাইট জ্বেলে দিয়েছেন জোস। তাতেও অবশ্য ঔজ্জ্বল্য তেমন বাড়ল না ঘরের, মলিন দেওয়াল যেন শুষে নিল আলো। সোফা, সেন্টার টেবিল, কাচের আলমারি সবই আছে, তবে প্রতিটি আসবাবেরই হতশ্রী দশা।কার্পেটটিও যথেষ্ট মলিন।একমাত্র টেলিভিশন সেটটিই যা নতুন।

সুনীলই পরিচয় দি সকলের।জোস হ্যালেগুয়া রীতিমতো বিস্মিত।বললেন, তোমরা সেই সুদূর ওয়েস্ট বেঙ্গল থেকে এসেছ?

পার্থ বলল, হ্যাঁ স্যার।এখানকার সিনাগগ আমাদের মুগ্ধ করেছে।

শুনে সম্মানিত বোধ করলাম।স্পষ্ট উচ্চারণে ইংরেজি বলছেন জোস, কিন্তু তোমরা হঠাৎ গ্রেট স্ক্রল দেখতে চাইছ কেন?

অবনী বললেন, ইতিহাস আমায় খুব টানে।আর প্রাচীন ইতিহাসের সঙ্গে আপনারা, ইহুদিরা তো ভীষণভাবে জড়িয়ে আছেন।আপনাদেরই এক উপাসনালয়ে এসে আপনাদের ধর্মীয় অনুশাসনলিপি দর্শন তত এক পরম সৌভাগ্যের বিষয়।

হুম।তা আমাদের এই সিনাগগ সম্পর্কে আপনার কী জানা আছে?

এই সিনাগগ তৈরি হয়েছিল পনেরোশো আটটিতে। ষোলোশো বাষট্টিতে পর্তুগিজরা এটিকে পুড়িয়ে দেয়। তার দুবছর পরে ডাচরা এই সিনাগগ ফের নতুন করে বানিয়ে দিয়েছিল। অবশ্য আপনাদের এই জু টাউন তৈরি হয়েছে তারও হাজার বছর আগে। ইয়েমেন আর ব্যাবিলন থেকে আসা ইহুদিদের হাতে। আসিরিয়ার

সম্রাট নেবুচাদনেজার জেরুজালেম দখল করার পর পালিয়ে এসেছিলেন ওই ইহুদিরা।ঠিক বলছি?

মোটামুটি।তবে আমরা কিন্তু ইয়েমেন বা ব্যাবিলনীয় ইহুদি নই।

সে আপনার চেহারা দেখেই অনুমান করা যায়। আপনারা সম্ভবত এসেছেন স্পেন থেকে। ফিফটিনথ সেঞ্চুরিতে।

এতক্ষণে জোসের ঠোঁটে অনাবিল হাসি, বাহ, আমাদের অনেক খবরই তো রাখেন দেখছি!

পাশ থেকে সাইমন বলে উঠলেন, জানেন তো, এই মাট্টানচেরির অনেকটাই কিন্তু আমাদের হাতে গড়া।

সেই আমরাই এখন মাট্টানচেরি থেকে হারিয়ে যাচ্ছি, মিসেস হ্যালেগুয়া এই প্রথম কথা বললেন, গোটা মাট্টানে আমরা পড়ে আছি মাত্র জনাষাটেক।তাও বেশির ভাগই বুড়োবুড়ি।আমাদের ছেলেমেয়েরা তো আর এ-দেশে থাকতেই চায় না।ভাবতে পারো, এর্নাকুলামের সিনাগগে এখন তালা ঝোলে?

দুঃখ কোরো না শ্যারন।ইহুদিদের জীবনটাই তো এরকম।

জোস হ্যালেগুয়া যেন সামান্য উদাস, এই বিশাল দুনিয়ায় কোথাও কি আমরা থিতু হতে পেরেছি? হয় তাড়া খেয়ে পালিয়েছি, নয় নিজেরাই ছুটছি। পৃথিবীর সব দেশেই আছি আমরা, কিন্তু কোথাও আমাদের স্থায়ী ঠিকানা থাকে কি?

সাইমন ঘড়ি দেখছেন।বললেন, আমরা কি ওঁদের এখন নিয়ে যেতে পারি?

চলুন। তবু মনে রাখবেন আমরা কিন্তু পবিত্র টোরা সহজে কাউকে দেখাই না। নেহাত সাইমন আপনাদের কথা দিয়ে ফেলেছে ...

সাইমন তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন, আমি কিন্তু আপনার অনুমতি নিয়ে তবেই হ্যাঁ বলেছি।

তুমি বললে আমি কি না করতে পারি সাইমন?

টুপুরের কেন যেন মনে হল, গ্রেট স্ক্রল দেখানো নিয়ে সাইমন আর জোসে একটা সুক্ষ্ম দ্বন্দ্ব চলছে।জোস কি খুবই অসন্তুষ্ট হয়েছেন?

বেশিক্ষণ অবশ্য কথা চালাচালি চলল না।জুতো গলিয়ে টুপুরদের নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন জোস হ্যালেগুয়া।

সিনাগগে আলো জ্বলছে। টিকিট কাউন্টারের ছেলেটি বসে-বসে হিসেব করছে টাকাপয়সার। সাইমন আর জোসকে অসময়ে দেখে ধড়মড়িয়ে উঠে দাঁড়াল, স্যার, আপনারা ...?

সাইমন বললেন, ওয়েস্ট বেঙ্গল থেকে এই অতিথিরা এসেছেন। এঁরা আমাদের গ্রেট স্ক্রল দেখবেন। তুমি বোসো, কাজ করো।

ব্যাগ রেখে জুতো ছেড়ে টুপুররা ঢুকল ভিতরে।বর্ণময় সিনাগগ আলোর ছটায় আরও অপরূপ এখন।

দেওয়ালসিন্দুকটা বেদির ওপারে। পরদায় ঢাকা। পরদা সরিয়ে সিন্দুকের তালা খুললেন জোস হ্যালেগুয়া। পাল্লায় হাত ছোঁওয়ানোর আগে চোখ বুজে বিড়বিড় করে কী যেন মন্ত্র উচ্চারণ করলেন।

সিন্দুক খোলার সঙ্গে সঙ্গে সিনাগগে যেন বাজ পড়ল।আর্তনাদ করে উঠেছেন জোস।

মহামূল্যবান গ্রেট স্ক্রলটা নেই!

.

০৩.

মাট্টানচেরি থানায় ফোন করেছিলেন সাইমন।মিনিট কুড়ির মধ্যে একজন সাব-ইনস্পেক্টর হাজির সঙ্গে আস্ত এক পুলিশবাহিনী।ভারী বুটের শব্দে থরথর কেঁপে উঠল জু টাউনের সরু গলি।

পুলিশ অফিসারটি বেজায় রাশভারী। যেমন তাগড়াই চেহারা, তেমন বাজখাই গলা। গায়ের রং কুচকুচে কালো, নাকের নীচে ইয়া পুরুষ্টু গোঁফ, মাথার কোঁকড়া চুল দক্ষিণী হিরোদের মতো ফাঁপানো। উর্দির বুকপকেটে পেতলের প্লেটে নাম লেখা পি ভি জর্জ।

সুনীল পরিচয় দিয়েছিল মিতিনের, পাত্তাই দিলেন না জর্জ।মানিব্যাগ খুলে নিজের প্রেসকার্ড দেখাল সুনীল, তাতেও জর্জের ভ্রূক্ষেপ নেই।এসেই প্রথমে প্রত্যেকের নাম-ঠিকানা টুকে নিলেন ঝটাঝট।অবনী আর পার্থকে এমন ক্রুর চোখে দেখতে লাগলেন, যেন চোর ধরেই ফেলেছেন, হাতকড়া পরাতেই যা দেরি। সিনাগগে দাঁড়িয়েই ছুড়তে শুরু করেছেন প্রশ্নবাণ। টুপুররা কলকাতা থেকে কবে এসেছে, কী জন্যে এসেছে, কেন তাদের গ্রেট স্ক্রল দর্শনের সাধ জাগল, জানলেন খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে। অবনীর মুখ শুকিয়ে আমশি, সহেলিও কাপছেন ঠকঠক।

সুনীল চাপা স্বরে সাহস জোগাল, ঘাবড়াবেন না স্যার।এখানকার ক্রাইম ব্রাঞ্চের কর্তা সম্পর্কে আমার দাদা। কাজিন।আমি এক্ষুনি তাকে মোবাইলে ধরছি।

এদিকে জর্জ পড়েছেন জোস হ্যালেগুয়াকে নিয়ে।জেরা করছেন কড়া গলায়।

আপনি গ্রেট স্ক্রল শেষ কখন দেখেছেন?

কাল।

কাল কখন?

সকালে।কাল আমাদের সাপ্তাহিক প্রার্থনাসভা ছিল, তখন।

আপনি কি কাল ওটা বের করেছিলেন?

হ্যাঁ।আমি প্রতি শনিবার টোরা পাঠ করি।

নিজের হাতে বের করেছিলেন?

হ্যাঁ।

তারপর রেখে দিয়েছিলেন? নিজের হাতে?

অবশ্যই।

ওই সিন্দুকের চাবি কি আপনার কাছেই থাকে?

রাবির কাছে থাকাটাই নিয়ম।

আমি নিয়ম জানতে চাইনি।আপনার কাছে থাকে কিনা প্রশ্ন করেছি।

প্রবীণ মানুষটিকে এমনিই বড় বিপর্যস্ত দেখাচ্ছিল। জর্জের রূঢ় প্রশ্নের ধাক্কায় আরও যেন বিধ্বস্ত হয়ে পড়ছিলেন তিনি।কাঁপাকাঁপা গলায় বললেন, চাবি আমার কাছেই ছিল।

আপনার বাড়িতে?

হ্যাঁ।

কোথায় রাখেন চাবি?

আমার টেবিলের ড্রয়ারে।

ড্রয়ার নিশ্চয়ই সব সময়ে তালাবন্ধ থাকে?

থাকে।আবার কখনও কখনও থাকেও না।

স্ট্রেঞ্জ! কেয়ারলেসলি চাবিটাকে ফেলে রাখেন?

আমার চাবি তো চুরি যায়নি।

আসল চাবি থেকে ডুপ্লিকেট তো বানিয়ে নেওয়া যায়? নাকি যায় না?

থতমত খেয়ে গেলেন জোস।চুপ করে আছেন।

জর্জ ফের তির ছুড়লেন, আপনি ছাড়া বাড়িতে আর কে কে থাকেন?

একজনই আছেন।আমার স্ত্রী শ্যারন।

ছেলেমেয়ে?

আমার দুটি মেয়ে।দুজনেরই বিয়ে হয়ে গেছে।

বাড়িতে তাদের আসা-যাওয়া আছে নিশ্চয়ই?

আমার বড় মেয়ে বস্টনে থাকে। ছোট তেল আভিভ। এক বছরের মধ্যে মেয়ে-জামাইরা কেউই কোচিতে আসেনি।

বাড়িতে কাজের লোক আছে তো?

না।আমার স্ত্রীই সব করেন।জোস হঠাৎই ফুঁপিয়ে উঠলেন, ভাবতে পারছি না... ভাবতে পারছি না।পেন্টা টিউক যে এভাবে চুরি যাবে এ আমার স্বপ্নেরও অতীত।

পেন্টা টিউক? জর্জের ভুরুতে ভাঁজ, তা হলে যে বললেন গ্রেট স্ক্রল চুরি গেছে?

আমরা ইহুদিরা, পবিত্র অনুশাসনলিপিকে পেন্টা টিউক বলি।আর অনুশাসনগুলোকে বলি টোরা।লিপিটাকে গুটিয়ে রাখা হয় বলে পেন্টা টিউককে গ্রেট স্ক্রল নামে ডাকা হয়।

জ্ঞান দেবেন না।...বাই দ্য বাই, গ্রেট স্ক্রলের সাইজ কীরকম?

ফুটখানেক মতো চওড়া।লম্বায় হাত তিনেক।

মানে গোটালে ক্যালেন্ডারের সাইজ?

বলতে পারেন।

দাম কত হতে পারে?

টাকার হিসেবে বলতে পারব না।তবে আমাদের কাছে অমূল্য।

মিতিনমাসির পাশে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসাবাদ শুনছিল টুপুর।চুরির সংবাদ পেয়ে ছুটে এসেছেন শ্যারন।তিনিও পাথরের মতো দাঁড়িয়ে।জু টাউনের আরও কয়েকজন বাসিন্দা ভিড় করেছেন দরজায়।প্রত্যেকের মুখেই উদ্বেগের ঘন ছায়া।এক প্রবীণা তো ফুঁপিয়ে উঠলেন।পাশের মানুষটি তাঁকে শান্ত করার চেষ্টা করছেন।

সাইমন ধরা-ধরা গলায় বললেন, পেন্টা টিউক যে কত মূল্যবান, একটা ব্যাপার থেকে আপনি আন্দাজ করতে পারবেন।ওই সিন্দুকে আরও দুটো দামি জিনিস ছিল, চোর কিন্তু দুটোর একটাতেও হাত দেয়নি।

দেখলাম তো।একটা সোনার মুকুট।একটা রুপোর বাতিদান।

সোনার মুকুটখানা ত্রিবাঙ্কুরের মহারাজা স্বয়ং দিয়েছিলেন।রুপোর বাতিদান কর্নেল মেক্লের উপহার।

বুঝেছি, বুঝেছি।চোর আসল অ্যান্টিক পিসটাই টার্গেট করেছে।এও বুঝতে পারছি গ্রেট স্ক্রল চুরি হওয়ার পেছনে আপনাদের রাবি মহাশয়েরও যথেষ্ট গাফিলতি আছে।

জোস হ্যালেগুয়া নতমস্তকে দাঁড়িয়ে।

সাইমন তাড়াতাড়ি বললেন, বৃদ্ধ মানুষটিকে কেন দোষ দিচ্ছেন মিস্টার জর্জ? কুড়ি বছরেরও বেশি উনি দায়িত্ব সামলাচ্ছেন, কখনও তো এরকম ঘটেনি।

চুরি একবারই হয়।জর্জের মুখ গোমড়া।তেরা চোখে সাইমনকে দেখতে দেখতে বললেন, আপনি তো সিনাগগের তত্ত্বাবধায়ক, তাই না?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

তা হলে দায়িত্ব তো আপনার উপরও বর্তায়।জর্জ গোঁফে মোচড় দিলেন, আপনাদের রাবি মহাশয় যদি মিথ্যে না বলে থাকেন, তা হলে চুরিটা ঘটেছে কাল সকাল থেকে আজ বিকেলের মধ্যে কোনও এক সময়ে। ঠিক কি না?

সাইমন আমতা-আমতা করে বললেন, হ্যাঁ মানে...সেরকমই তো দাঁড়ায়।

দাঁড়ায় নয়, সেটাই ঘটেছে।জর্জ হুঙ্কার ছাড়লেন, এই দেড় দিন আপনার সিকিউরিটি কি ভেরেণ্ডা ভাজছিল?

আমি অবশ্যই তাদের চার্জ করব।তবে স্যার... আমরা নামী কোম্পানির গার্ড রাখি।তাদের বিরুদ্ধে কোথাও কোনও অভিযোগ নেই।

কী করে এত নিশ্চিত হচ্ছেন? রক্ষী হোক, আর যে-ই হোক, মতিভ্রম তাদের হতেই পারে।চুরির সঙ্গে যুক্ত থাকাও মোটেই অসম্ভব নয়।

কিন্তু স্যার...?

দেখুন মিস্টার পেরেজ, হয় আপনার রক্ষীরা জড়িত, নয় তারা একেবারেই অপদার্থ।নইলে তাদের নাকের

ডগা দিয়ে চোর ভিতরে ঢুকে পড়ে? সিন্দুক খুলে বেমালুম একটা জিনিস হাপিস করে দেয়? আমার তো মনে হয় ওদের কাউকেই সন্দেহের বাইরে রাখা যাবে না।আপনি প্রত্যেকের নাম আর বায়োডাটা আমায় দিয়ে দেবেন।আমি সব কটাকে থানায় ডেকে পাঠাব।

আচ্ছা স্যার।

সিনাগগে আর কোন কোন কর্মী আছে?

তিনজন ঝাড়পোঁছ করে।আর টিকিট কাউন্টারে বসে দুজন।পালা করে।তাদের একজন এখনও আছে।ডেকে দেব?

থাক।নামগুলো দিয়ে দিন।আর হা, আপনাদের রাবি মহাশয়ের বাড়িতে কারা কারা যাতায়াত করে তার তালিকা আমার চাই।

সে তো স্যার, এখানকার সব ইহুদি পরিবারই মিস্টার হ্যালেগুয়ার বাড়িতে যায়।আমরা ছোট্ট কমিউনিটি, মিস্টার হ্যালেগুয়া আমাদের সকলেরই অভিভাবকের মতো। বিপদে আপদে পরামর্শ দেন, সামাজিক অনুষ্ঠানও ওঁর নির্দেশ মতো হয়।

আবার গর্জে উঠতে যাচ্ছিলেন জর্জ, বাইরে জিপের আওয়াজ।

সুনীল উত্তেজিতভাবে বলে উঠল, ওই যে... চেত্তান এসে গেছেন।

কে চেত্তান?

মানে দাদা।আমরা দাদাকে চেত্তান বলি।

কথার মাঝেই প্রবেশ করেছেন পুলিশকর্তাটি।বছর পঁয়তাল্লিশ বয়স, দোহারা চেহারা, তামাটে রং।উর্দির কাঁধে আই পি এসের ব্যাজ।বুকে নামটাও ঝুলছে সতীশ মেনন।

উৎকণ্ঠিত স্বরে সতীশ বললেন, কী ব্যাপার? কখন হল চুরি?

জর্জ নয়, সুনীলই এগিয়ে গিয়ে মলয়ালম ভাষায় পুরো ঘটনা বর্ণনা করল সতীশকে।মন দিয়ে শুনলেন সতীশ, আলাপ করলেন মিতিন-অবনীদের সঙ্গে।মিতিন একজন গোয়েন্দা শুনে সপ্রশংস দৃষ্টিতে তাকালেন।

সতীশ আসামাত্র থমকে গিয়েছিলেন জর্জ।সুনীলের সঙ্গে সতীশের ঘনিষ্ঠতার বহরে তাঁর হম্বিতম্বিও উধাও। সতীশ অবশ্য তাকেও আলাদা ডেকে কথা বললেন খানিকক্ষণ।তারপর মলয়ালমেই নির্দেশ দিলেন কী সব। বাধ্য অধস্তনের মতো ঘাড় নেড়ে সতীশকে স্যালুট ঠুকলেন জর্জ।

আবার একপ্রস্থ জিজ্ঞাসাবাদের পালা।এবার শুধু জোস সাইমন নন, প্রশ্ন করা হল শ্যারনকেও।টিকিট কাউন্টারের ছেলেটি আর রক্ষীদের ডেকেও জেরা করলেন সতীশ।কোনও সন্দেহজনক লোককে তারা দুচার দিনের মধ্যে দেখেছে কিনা, কে কটায় আসে, কটায় যায়, কাল ছুটির দিনে কে কোথায় ছিল, কে কত দিন কাজে ঢুকেছে, ইত্যাদি ইত্যাদি।কাউন্টারের ছেলেটা উত্তর দেবে কী, ভয়েই সে থরহরিকম্পমান।

জর্জ ইতিমধ্যে জোসের কাছ থেকে সিন্দুকের চাবিখানা চেয়ে নিয়েছিলেন।দেখছিলেন উলটেপালটে৷ আঙুল দিয়ে খুঁটলেন চাবিটাকে।হতাশভাবে মাথা নাড়ছেন।

মিতিন জিজ্ঞেস করল, আপনি কি চাবির গায়ে সাবান আছে কি না পরখ করছেন?

ইয়েস ম্যাডাম।সাধারণত সাবানেই তো চাবির ছাঁচ তোলা হয়।

পেলেন কোনও চিহ্ন?

বোঝা যাচ্ছে না।ফরেনসিক করালে অবশ্যই ধরা পড়বে।

একটা সোজা পদ্ধতিও অ্যাপ্লাই করে দেখতে পারেন। চাবিটাকে জলে ডুবিয়ে নাড়ুন। সামান্যতম সাবান থাকলেও ফেনা দেখা দেবে।

এতক্ষণ পরে হাসির রেখা ফুটল জর্জের মুখে, ভাল অ্যাডভাইস দিয়েছেন তো ম্যাডাম।

রিংসুদ্ধ চাবি জলে ফেলা হল।সত্যিই ফুটেছে সাবানের ফেনা।অতি সামান্য হলেও বোঝা যাচ্ছে স্পষ্ট।

সতীশ বললেন, যাক, একটা ব্যাপারে অন্তত নিশ্চিন্ত।সিন্দুকের চাবি কেউ নকল করেছে।নাউ উই হ্যাভ টু ফাইন্ড আউট দ্য কালপ্রিট।

জোস হাউমাউ করে কেঁদে উঠলেন, আমারই দোষ, আমারই দোষ।আপনারা আমাকেই শাস্তি দিন।আমার অসাবধানতার জন্যই...

সতীশ জোসের পিঠে হাত রাখলেন, শান্ত হোন মিস্টার হ্যালেগুয়া।গ্রেট স্ক্রল আপনাদের কাছে যতটা পবিত্র, আমাদের কাছেও ঠিক ততটাই মূল্যবান জাতীয় সম্পদ।গ্রেট স্ক্রল আমরা উদ্ধার করবই।

সিনাগণে কড়া পুলিশ প্রহরা রাখতে বলে বেরিয়ে এলেন সতীশ মেনন।টুপুররাও এসে দাঁড়িয়েছে জু টাউনের গলিতে।

সতীশ সুনীলকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা এখন যাবে কোথায়?

ভেবেছিলাম মেনল্যান্ডে ফিরে স্যারদের নিয়ে একটু সিটিতে ঘুরব। তা তো আর হল না। আটটা বাজে, স্যারদের আজ ডিনারে ডেকেছি..

তা হলে তো সোজা বাড়ি চলে যাওয়াই ভাল।কিন্তু যাবে কীসে?

ট্যাক্সি ধরে নেব।

আমার জিপেও চলে আসতে পারো।আমি তোমাদের ড্রপ করে দিচ্ছি।

তোমার অসুবিধে হবে না তো চেত্তান?

অসুবিধে তোমার অতিথিদেরই হবে একটু।আমার সঙ্গে দুজন সেপাই আছে, গাদাগাদি হয়ে যাবে।

নো প্রবলেম। পার্থ তড়িঘড়ি বলে উঠল, আমরা ম্যানেজ করে নেব। যেতে যেতে আপনার সঙ্গে জমিয়ে গপ্পোও করা যাবে।

দ্যাটস মাই প্লেজার।

নামে জিপ হলেও মোটামুটি জায়গা আছে গাড়িটায়।চেপেচুপে উঠে পড়ল সবাই।

দীর্ঘক্ষণ চুপ ছিলেন সহেলি, গাড়ি নড়ে উঠতেই গজগজ করে উঠলেন, একজনের একটা বিদঘুটে শখের জন্য গোটা সন্ধেটাই মাটি হল।কী দরকার ছিল ওই গ্রেট স্ক্রল দেখতে চাওয়ার?

অবনী আত্মরক্ষার সুরে বললেন, আহা, আমি জানব কী করে এত কাণ্ড হবে?

ভাগ্যিস মিস্টার মেনন এলেন, নইলে দারোগা তো আমাদেরই হাজতে পুরতেন।আর হাজতে ঢোকালে দু-চার ঘা কি দিত না?

সুনীল হেসে উঠল, অত ভয় পাওয়ার কিছু নেই ম্যাডাম। আমাদের কেরালায় পুলিশ লকআপে যথেচ্ছ মারধোর করা যায় না।জানেন তো, এখানে একটা ছাত্রকে হাজতে পিটিয়ে মারার জন্য সরকারের গদি চলে গিয়েছিল।বলতে বলতে পাশে সতীশের দিকে ঘুরল সুনীল।ইংরেজিতে বলল, আমার স্যারকে কিন্তু তোমার ধন্যবাদ দেওয়া উচিত চেত্তান। স্যারের জন্যই কিন্তু চুরিটা একদিনের মধ্যে ধরা পড়ল। নইলে নেক্সট শনিবারের আগে তো কিছুই জানা যেত না।

ইয়েস।দ্যাটস আ পয়েন্ট।সতীশ মাথা দোলালেন, তবে চুরিটা আমায় খুব চিন্তায় ফেলল, বুঝলে।এ নিয়ে মিনিস্ট্রিতে তো হইচই পড়ে যাবে।

মিতিন বলল, আমি কিন্তু কালপ্রিটের ব্যাপারে একটা হিন্ট দিতে পারি।

কী বলুন তো?

সিন্দুক যে খুলেছে সে মোটেই প্রফেশনাল চোর নয়।

নেহাতই আনাড়ি।তাকে টাকার টোপ দিয়ে কাজটা করানো হয়েছে।

কী করে বুঝলেন?

পেশাদার চোর হলে থোড়াই চাবির গায়ে সাবানের কুচি লেগে থাকত।তবে তার পেছনেও অন্য কোনও পাকা মাথা আছে। যে জিনিসটার দাম সম্পর্কে ওয়াকিবহাল। সামান্য একটা ছাগলের চামড়া সাধারণ চোর চুরি করতে যাবে কেন?

রাইট।যে নিয়েছে সে বুঝেশুনে বড় দাঁও মারার জন্যেই...।

সতীশের চোয়াল শক্ত হল। ফের বলে উঠলেন, ধরে ফেলব। লোকটাকে আমি ধরবই। গ্রেট স্ক্রলও উদ্ধার হবে।

অবনী বললেন, কিন্তু সে জিনিস কি এখন আর কোরি ত্রিসীমানায় আছে? জল, স্থল, অন্তরীক্ষ, কোন পথে যে পাচার হয়ে গেছে তার ঠিক কী।

টুপুর ফস করে বলে উঠল, একটা ব্যাপার আমার মাথায় ঢুকছে। না। ওই জিনিস কিনবে কে? কেনই বা কিনবে? প্রকাশ্যে তো রাখতে পারবে না।কাউকে দেখাতেও পারবেনা।নিয়ে তার লাভটা কী হবে?

দুনিয়ায় অনেক ধরনের খ্যাপা থাকে রে। মিতিন মৃদু হাসল, তাদের মধ্যে কেউ কেউ আবার কোটিপতি। তারা জিনিসটা নিয়ে নিজের গোপন ভল্টে লুকিয়ে রেখে দেয়। মনে তার একটাই আনন্দ, আজ থেকে সে ওই দুষ্প্রাপ্য জিনিসটার মালিক। ওই আনন্দের লোভে তারা চোরাই মূর্তি কেনে, পেন্টিং চুরি করায়, কোহিনূর-টোহিনূরের মতো বিখ্যাত হিরে পর্যন্ত বাঁকা পথে কিনে নিজের কবজায় রেখে দেয়।চোর কখনও-সখনও হাতেনাতে ধরা পড়ে।কিন্তু এই লোকগুলো চিরকাল আড়ালেই থেকে যায়।

টুকরো টুকরো আলোচনার মধ্যে সতীশ মেননের জিপ মাট্টানচেরি বাজার পেরিয়ে, উইলিংডন দ্বীপ ছুঁয়ে, ভেম্বুরুথি ব্রিজ অতিক্রম করে এসে পড়েছে মূল ভূখণ্ডে।নটা বাজার আগেই গাড়ি সুনীলের বাড়ির দরজায়।

সুনীলের বাবা-মা আদরযত্ন করলেন খুব। শুধু বাঙালি খানাই নয়, দু-একটা কেরলীয় পদও বেঁধেছেন সুনীলের মা। হরেকরকম সবজি দিয়ে অ্যাভিয়ান। ক্যারিমিন পল্লিচাথু বলে এক ধরনের মশলাদার ফ্রাই, সামুদ্রিক মাছের।আর শেষপাতে দুধ, নারকেল আর কলা দিয়ে বানানো কালন।সুনীলের মা-র রান্নার হাত সত্যিই অতুলনীয়। শেষ তিনটে রান্নাই এত সুস্বাদু যে, অবনীর মতো বাতিগ্রস্ত মানুষও চেটেপুটে খেয়ে ফেললেন। খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে কলকাতার খবরাখবর নিলেন সুনীলের বাবা, এখানে অবসরজীবন কেমন কাটছে তাও শোনালেন।সিনাগগের চুরি নিয়েও গবেষণা চলল খানিকক্ষণ।বাড়ি থেকেই চেনা ট্রান্সপোর্ট এজেন্সিতে ফোন করল সুনীল, কাল টুপুরদের জন্য গাড়ি ঠিক করে দিল।

সুনীলদের বাড়ি থেকে বেরোতে-বেরোতে প্রায় এগারোটা।ট্যাক্সি ডেকে ড্রাইভারকে গন্তব্যস্থল বুঝিয়ে দিল সুনীল।বুমবুম ঘুমিয়ে কাদা, তাকে ধরাধরি করে শুইয়ে নেওয়া হল কোলে।

পথ-ঘাট ফাঁকা-ফাঁকা।দোকানপাটের ঝাঁপ পড়ে গেছে বহুক্ষণ, গাড়িঘোড়াও চলছে না বড় একটা।আকাশে ছেঁড়া-ছেঁড়া মেঘ।পলকের জন্য কৃষ্ণপক্ষের চাঁদ উঁকি দিল, পলকে হারিয়ে গেল মেঘের আড়ালে।

পার্থ একটা জাম্বো হাই তুলে বলল, আজ খাওয়াটাই যা লাভ, বাকি গোটা দিনটাই তো ফালতু কাটল।

টুপুর বলল, সে কী? অমন একটা রোমহর্ষক কাণ্ড ঘটল, তাতেও তোমার মন ভরেনি?

টুরিস্ট হিসেবে আমরা কী পেলাম? সেন্ট ফ্রান্সিস চার্চ বন্ধ, সিনাগগে যাব বলে চাইনিজ ফিশিং নেট দেখা হল না, গ্রেট স্ক্রুলের বদলে পড়লাম এক রাগী পুলিশের পাল্লায়...

সহেলি বললেন, মার্কেটিংও হল না।

মিতিন ঘাড় ঘুরিয়ে কী যেন দেখছিল।সোজা হয়ে বলল, ব্যাক ওয়াটারে মোটরবোট চড়া তো হয়েছে।বাজার আর চাইনিজ নেট নয় ফেরার দিনে হবে।

একটা কথা জিজ্ঞেস করব মিতিনমাসি? কোচিতে চাইনিজ মাছ ধরার জাল এল কী করে? এখানে চিনা বসতি আছে নাকি?

এখনকার কথা বলতে পারব না। তবে এক সময়ে তো নিশ্চয়ই ছিল। কোচি নামটাই তো নাকি চিনাদের দেওয়া।অবশ্য লোকাল লোকরা অনেকেই তা মানতে চায় না।বলে কোচি নামটা এসেছে মলয়ালম কোছাজি শব্দ থেকে।কোছাজি মানে ছোট্ট।

অবনী বললেন, আরও একটা মত আছে। মলয়ালমে কোচি মানে বন্দর। তবে এও ঠিক, ওই মাছের জাল নাকি চিনের বাইরে কোচি ছাড়া আর কোথাও মেলে না। সুতরাং কুবলাই খাঁর আমলে এখানে আসা চিনা বণিকরা যদি কোচি নামটা রেখেও থাকে, তাতেও অবাক হওয়ার কিছু নেই।

হোটেল এসে গেছে। ভিতরে ট্যাক্সি ঢুকিয়ে ভাড়া মেটালেন অবনী। ঘুমন্ত বুমবুম এখন বেজায় ভারী, তাকে কোলে নিয়ে হাঁটা সত্যিই কষ্টকর। পার্থ ঝাঁকিয়ে ঝাঁকিয়ে জাগাল তাকে। ঠেলে-ঠেলে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে দোতলায়।নেশাভুর মতো টলছে বুমবুম, দেখে টুপুর হেসে কুটিপাটি।

হাসতে-হাসতেই হঠাৎ নজর গেল মিতিনমাসি হোটেলে ঢোকেনি, নেমেই গেটে গিয়ে ঝুঁকে ঝুঁকে রাস্তায় কী যেন দেখছে।

দৌড়ে মিতিনমাসির পাশে এল টুপুর, কী হয়েছে গো?

মনে হচ্ছে একটা অটো আমাদের পিছন-পিছন আসছিল।মিতিন আঙুল তুলল, ওই যে।ওই চলে যাচ্ছে!

সেকেন্ডের জন্য অটোটাকে দেখতে পেল টুপুর।তারপরই অটোটা ঘুরে গেল বাঁয়ে।বড় রাস্তা ছেড়ে গলির মধ্যে।

টুপুর অবাক হয়ে বলল, অটো আমাদের ফলো করছিল? কোচিতে? কেন?

মিতিন বলল, বুঝতে পারছি না।অবশ্য আমার মনের ভুলও হতে পারে।

৪-৬

প্রথম থামা হল আলওয়েতে। কোচি শহর ছেড়ে পনেরো-বিশ কিলোমিটার গিয়ে। একটা বাজার মতো অঞ্চলের প্রান্তে প্রকাণ্ড উনুনে অতিকায় কড়ায় কী যেন ভাজাভুজি চলছে দেখে আর লোভ সামলাতে পারল না পার্থ।হেঁকে উঠল, হল্ট।

গাড়ি থেকে নেমে পার্থ পর্যবেক্ষণ করে এল খাদ্যদ্রব্যটি। ঘোষণার ঢঙে বলল, পাকা কলার বেসনফ্রাই। বেগুনি ভেবে খেতে পারো।অর্ডার দেব?

দিতে পারো।মিতিন বলল, খিদে তো পেয়েছেই।এখনও পর্যন্ত কফি ছাড়া তো কিছু পেটে পড়েনি।

সহেলি নাক সিঁটকালেন, তা বলে পাকা কলার বড়া? আলুর চপটপ নেই?

টুপুর বলল, নতুন জিনিস টেস্ট করো না মা।তা ছাড়া কলা তো ভাল জিনিস।হাই ভিটামিন।দ্যাখোনি, টেনিস প্লেয়াররা খেলার ফাঁকে গপগপ কলা খায়।

যুক্তিতে না পেরে সহেলি অসহায় গলায় বললেন, ও পার্থ, তুমি যে বলেছিলে ভাল জায়গায় ব্রেকফার্স্ট করাবে?

কথা সেরকমই ছিল বটে।পরিবহন এজেন্সির টয়োটা কোয়ালিস ছটা বাজার আগেই চলে এসেছিল হোটলে। পার্থ অবনীকে ঘুম থেকে তুলে, বুমবুমকে তৈরি করে, জিনিসপত্র গুছিয়ে সেজেগুজে বেরোতে বেরোতে সাতটা।তখন ব্রেকফাস্টে বসলে আরও কি দেরি হয়ে যেত না!

পার্থ হেসে বলল, আপাতত এটা দিয়েই শুরু হোক না।পথে নয় আবার নয় দাঁড়ানো যাবে।

দু মিনিটে গরমাগরম কলাভাজা হাজির। সঙ্গে কফিও। অনিচ্ছা সত্ত্বেও সহেলি কামড় দিলেন কলাভাজায়। পলকে মুখ হাসিতে ভরে গেল।চিবোচ্ছেন কচর কচর।

অবনীকে বলেন, খাও না, একটু মুখে দিয়ে দ্যাখো।

নতুন বস্তুটি চাখতে অবনী একেবারেই রাজি নন।বললেন, আমার কফিই ঠিক আছে।

খালি পেটে বারবার কফি খাবে? তোমার ব্যাগে তো বিস্কুট আছে, বার করে নাও না!

আছে বুঝি?

আজ্ঞে হ্যা স্যার।আমি নিজে কাল রাতে দেখেছি।

আমার ব্যাগ কোথায়?

মিতিন বলল, টুপুর, পিছনে দ্যাখতো।

টুপুর আর বুমবুম ব্যাকসিটে।টুপুরের পায়ের কাছে একটা লাল ব্যাগ।সে নিচু হওয়ার আগেই বুমবুম ঝুঁকে পড়ে চেন খুলেছে, এটা তো বাবার ব্যাগ! ক্যামেরা আছে।

অবনীদার ব্যাগ বোধ হয় তা হলে ছাদে।

বেরনোর সময়েই জিনিসপত্র সব গাড়ির মাথায় তুলে ঢাকা দেওয়া হয়েছিল তেরপলে। ঢাকা সরিয়ে

ব্যাগটাকে খুঁজল পার্থ।চেঁচিয়ে বলল, ও অবনীদা, আপনার ব্যাগ তো এখানেও নেই!

সে কী? গেল কোথায়? হোটেলে ফেলে এলে নাকি?

ব্যস, শুরু হয়ে গেল দোষারোপের রিলে রেস।অবনী সহেলিকে দুষছেন, সহেলি মিতিনকে, মিতিন পার্থকে। বেরনোর মুখে ডামাডোলের মাঝে অবনীর লাল ব্যাগ যে কাবার্ডেই রয়ে গেছে এ এখন জলের মতো পরিষ্কার।

অবনী হায় হায় করে উঠলেন, কী হবে এখন?

সহেলি তপ্ত স্বরে বললেন, ভালই হয়েছে, আপদ গেছে।যে মানুষ নিজের একটা জিনিসও খেয়াল রাখতে পারে না, তার এরকমই হয়।

কিন্তু ব্যাগ ছাড়া আমার চলবে কী করে? ওতে আমার ছাতা আছে, পাজামা-পাঞ্জাবি আছে, দাড়ি কমানোর সরঞ্জাম আছে...।

ভালই তো হল।রেবতী ইন্টারন্যাশনালের বেয়ারা এখন পাজামা-পাঞ্জাবি পরে, শেভিং সেটে দাড়ি কামিয়ে, ছাতা মাথায় কোচির রাস্তায় হাওয়া খাবে।

টিজ কোরো না।টিজ কোরো না।আমি কিন্তু রেগে যাচ্ছি।

কুল, কুল।মিতিন ঝটপট ভ্যানিটিব্যাগ থেকে মোবাইল ফোন আর রেবতী ইন্টারন্যাশনালের কার্ডটা বের করল।টকটক বোতাম টিপে চলন্ত দূরভাষে ধরল হোটেল ম্যানেজারকে।মিনিট তিনেক কথা বলে হাসিমুখে জানাল, নো চিন্তা।হোটেলের বেয়ারা কাউন্টারে ব্যাগ জমা করে দিয়েছে।ব্যাগ এখন হোটেলের জিন্মায়। ওরা বলে দিল, উদ্বেগের কিছু নেই, আপনারা তো কোচিতে ফিরবেনই, তখন কালেক্ট করে নেবেন।

আমি ততদিন দাড়ি কামাব কী করে? অবনীর গালে হাত।করুণ স্বরে বললেন, এই পার্থ, গাড়ি ঘোরানো যায় না?

খবরদার না।ওই কটা ফালতু জিনিসের জন্য মিছিমিছি তেল পোড়ানোর কোনও প্রয়োজন নেই।সহেলি কড়া গলায় বললেন, পার্থ, উঠে এসো।

কফি কলাভাজার দাম মিটিয়ে গাড়িতে ফিরেছে পার্থ।ছুটল টাটা কোয়ালিস।চলেছে খাড়া পুব মুখে।দেখতে-দেখতে শহরের ছবি মিলিয়ে গিয়ে দুধারে গ্রামীণ দৃশ্য।নতুন ধান বোনা হচ্ছে খেতে, চোখ জুড়নো কচি সবুজ রঙে ছেয়ে আছে চারদিক।গোটা রাজ্যটাই কী সবুজ।বাড়িঘরগুলো ভালভাবে লক্ষ না করলে হঠাৎ যেন পশ্চিমবঙ্গ বলে ভুল হয়।

পার্থ ইংরেজিতে ড্রাইভারকে বলল, একটা ভাল ধাবা দেখে গাড়ি দাঁড় করাও তো দেখি।

হাসিখুশি চেহারার ড্রাইভারটির বয়স বড়জোর সাতাশ-আঠাশ।চকচকে কালো রং, একমাথা ঘন চুল, রোগা হলেও হাড়টাড়গুলো বেশ চওড়া।নাম টমাস ম্যাথু।কেরলীয় ক্রিশ্চান।কোচিতেই বাড়ি।ম্যাথু হিন্দি ইংরেজি দুটোই বলতে পারে, তবে ছাড়া-ছাড়া।পার্থর কথায় সচকিত হয়ে সে প্রশ্ন করল, হোয়াট স্যার? হোয়্যার স্টপ?

ধাবা, আই মিন, রোডসাইড ফুডজয়েন্ট।আমরা ব্রেকফার্স্ট করব।

ব্রেকফার্স্ট শব্দটা খুব বুঝেছে ম্যাথু।ঢক করে ঘাড় নাড়ল।গাড়ির গতি বাড়িয়েছে একটু।মিনিট কয়েকের মধ্যে এক জনপদে পৌছে ব্রেক কষেছে।ছোটখাটো একখানা রেস্টুরেন্ট দেখিয়ে বলল, গুড ফুড স্যার।

ইডলি-আপ্পান-বড়া সব মিলে গা।

তা এখানেও ঠিক প্রাণ ভরে খেতে পারলেন না অবনী-সহেলি।ইডলি চলবে না বলে পুরি-সবজি নিলেন বটে, নতুন ধরনের তরকারির স্বাদ জিভে রুচল না।বিরস মুখে পুরি গিলতে গিলতে আর একবার ব্যাগের শোক উথলে উঠল অবনীর।তাঁর দ্বিতীয় চশমাখানাও নাকি ওই ব্যাগে রাখা ছিল।

শুনে সহেলি বললেন, তোমাদের দাবার বোর্ডটাও নিশ্চয়ই ওখানে?

না দিদি।পার্থ ফিচেল হাসল, কালই ওটা আমার ব্যাগে ভরে রেখেছি।

উদ্ধার করেছ।মিতিন তাড়া লাগাল, এবার চটপট গাত্রোত্থান করো তো।এমন ঢিকিয়ে-ঢিকিয়ে চললে মুন্নার পৌঁছতে বিকেল হয়ে যাবে।

এর পর আর অবশ্য বেশি দাঁড়াল না গাড়ি।ইদুক্কি ডিস্ট্রিক্ট আসা পর্যন্ত বেশ ভাল গতিতেই ছুটল।তারপর শুরু হয়েছে পাহাড়ি রাস্তা।পথ আর মসৃণ নয়, চড়াই-উতরাই পড়ছে অজস্র।দুপাশে দেখা যায় ছোট-বড় জঙ্গল।

পাহাড় টপকে-টপকে মুন্নার পৌছনোর আগে রাস্তার ধারেই জলপ্রপাত পড়ল একটা ছোট্ট, কিন্তু ঝিমঝিম আওয়াজ তুলে ঝরে পড়ছে ধারা।গাড়ি থামিয়ে হুড়মুড়িয়ে নেমে পড়ল সকলে।জলধারা দেখে বুমবুমের যেন আহ্লাদ আর ধরে না, ম্যাথুর সঙ্গে নেমে গেল একেবারে সামনেটায়।জামা-প্যান্ট ভেজাল প্রাণের সুখে। পিছল পিছল পাথর বেয়ে মিতিন-টুপুরও গেছে ধারার কাছে।ছিটকে আসা জলকণা মাখছে চোখে-মুখে। কাঁধে ব্যাগ নিয়ে একটু উপর থেকে পার্থ ছবি তুলছে টপাটপ।

ঠিক তখনই নির্জন রাস্তায় এক অ্যাম্বাসাডার।গাড়িটা জলপ্রপাত পেরিয়ে এগিয়ে গিয়েছিল, ব্যাক করে থামল ঘ্যাচাং।দুটো ষণ্ডা চেহারার লোক বেরিয়ে এসেছে দরজা খুলে।পরনে সাদা লুঙ্গি, সাদা হাফশার্ট।গায়ের রং মেটে-মেটে! একজনের গোঁফ আছে, একজনের মাথায় টাক।

টাকমাথা লোকটা অবনীকে কী যেন বলছে, অবনী জোরেজোরে মাথা নাড়লেন।গুঁফো সোজা গিয়ে দাঁড়াল ছোট্ট ব্রিজটার ওপর।টুপুরদের খানিক দেখে নিয়ে কোমরে হাত রেখে পায়চারি করছে।টাকমাথা গেল গুঁফোর কাছে, কী যেন বলাবলি করল।তারপর পার্থকে দেখতে দেখতে গাড়িতে ফিরে গেছে।রমণীয় নিসর্গে একরাশ কালো ধোঁয়া ছড়িয়ে হুশ করে মিলিয়ে গেল অ্যাম্বাসাডার।

টুপুর এসে অবনীকে জিজ্ঞেস করল, লোকটা তোমায় কী বলছিল গো বাবা?

বুঝলাম না।মলয়ালম।

মিতিন বলল, মলয়ালম কেন? তামিল-তেলুগুও তো হতে পারে।

নাহ, মলয়ালমই।একটা-দুটো শব্দ চিনতে পেরেছি।

কী রকম?

যেমন এনথানে।মানে, কী।পয়ভারুকা।মানে, গুড বাই।

কার কাছ থেকে শিখলে? সুনীলদাদা?

অবনী জবাব না দিয়ে হাসলেন।

সঙ্গে সঙ্গে সহেলির ধমক, হেসো না।লোকদুটোকে আমার মোটেই সুবিধের লাগেনি।

অসুবিধেটা কী করেছে?

ওরা ঘুরে এল কেন? দাঁড়ালই বা কেন? গুঁফো কোমরে হাত দিয়ে কী দেখছিল? দৃষ্টি দেখেছিলে লোটার? কী রকম ঢুলুঢুলু? ভিলেনদের মতো?

ব্যস, শুরু হয়ে গেল জল্পনা-কল্পনা। কী মতলব ছিল লোক দুটোর, কেনই বা দেখেশুনে কেটে পড়ল, ছিনতাইয়ের ধান্দা করলে পার্থ ছেড়ে কথা বলত না, খালি হাতেই মোকাবিলা করত, এই সব।

কথাবার্তা চলতে-চলতেই এসে গেছে মুন্নার। সমুদ্রতল থেকে প্রায় পনেরোশো মিটার উঁচুতে মুন্নার সত্যিই এক মনোরম উপত্যকা। চারদিকে ঘন সবুজ পাহাড়, যেদিকে তাকাও পাহাড়ের ঢাল বেয়ে নরম গালিচার মতো নেমে এসেছে চা-বাগান।এই দুপুরেও একটা ঠান্ডা আমেজ ছড়িয়ে আছে মুন্নারের বাতাসে।

সুনীল মুন্নার ক্লাবে থাকার কথা বলে দিয়েছিল।সেইমতে মেন রোড ছেড়ে গাড়ি আরও খানিক উঠল উপরে। আদতে ক্লাব হলেও ভাড়া দেওয়ার জন্য ঘর আছে কয়েকখানা। মূল বিল্ডিং থেকে একটু তফাতে। কটেজের মতো।

ক্লাবের লনে পা রেখে টুপুর উচ্ছ্বসিত, ওয়াও! দ্যাখো মিতিনমাসি, এখান থেকে চারপাশটা একদম পেন্টিংয়ের মতো লাগছে না?

সত্যিই অসাধারণ। মিতিনও দেখছে চোখ ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে, নীচে পুরো মুন্নার টাউনটা দেখা যাচ্ছে, চারদিকে গোল হয়ে ঘিরে আছে পাহাড়...! আকাশটাও দ্যাখ, মনে হচ্ছে না অনেক নীচে নেমে এসেছে?

বুমবুম বিজ্ঞের মতো বলল, এখানেই কিন্তু আমরা থাকব মা।জায়গাটা দার্জিলিংয়ের চেয়েও বিউটিফুল।

সহেলি সায় দিলেন, বুমবুম ঠিকই বলেছে।দার্জিলিঙে বড় মেঘ এসে পড়ে গায়ে।

অবনীকে নিয়ে পার্থ ঘর দেখতে গিয়েছিল। ঘুরে এসে বলল, রুমের কোয়ালিটি কিন্তু সো-সো। বাথরুমও তেমন সুবিধের নয়।অন্য হোটেল দেখব?

সহেলি বললেন, আর দেখাদেখিতে যেয়ো না পার্থ। এক-দুদিনের তো মামলা.. স্পটটাও খুব সুন্দর... এখানেই ব্যবস্থা করে ফ্যালো।

সামনের কটেজটায় পাশাপাশি দুটো ঘর নেওয়া হল। মিতিনদের ঘরটার আবার এদিক নেই ওদিক আছে। খাট বলতে সাধারণ চৌকি, তার উপরে পাতলা তোশক, ড্রেসিংটেবিল-ট্রেসিংটেবিলেরও বালাই নেই, দেওয়ালে ঝুলছে ফ্রেমে বাঁধানো আয়না, ওদিকে ঘরের সঙ্গে ফাকা অ্যান্টিরুম আছে একটি। বাথরুমের সামনেও ছোট্ট একফালি জায়গা।

মুখ-হাত ধুয়ে, জামাকাপড় বদলে তাজা হয়ে নিল সবাই।ক্লাবে আগে থেকে না বলে রাখলে খাবার পাওয়া যায় না, মধ্যাহ্নভোজের জন্য আবার বেরোতে হবে এক্ষুনি। এমন সময়ে অবনী হঠাৎ ভগ্নদূতের মতো মিতিনদের দরজায়।শুকনো মুখে বললেন, সর্বনাশ হয়ে গেল!

কেন? কী হয়েছে?

একটা গোখখুরি করে ফেলেছি।লাল ব্যাগের পকেটে আমার ক্রেডিট কার্ডটা রেখেছিলাম।

বাক্য শেষ হতে না-হতে হাউমাউ করে উঠেছেন সহেলি, কী হবে এখন? কারও হাতে ওই কার্ড পড়লে সে

যদি টাকা তুলে নেয়?

দাঁড়াও, দাঁড়াও।উত্তেজিত হোয়ো না।প্রথম কথা, অবনীদার সিক্রেট কোড না জানলে কেউ টাকা তুলতে পারবে না।সেকেন্ডলি, ও ব্যাগ তো সেফ কাস্টডিতেই আছে।হোটল ম্যানেজারের হেফাজতে।

তা ঠিক।তবু তুমি আর-একবার হোটেলে ফোন করে দাও না মিতিন।

টুপুর বলল, এক কাজ করলে হয় না মিতিনমাসি? তুমি বরং সুনীলদাদাকে জানিয়ে দাও।সুনীলদাদা গিয়ে ব্যাগটা নিয়ে এলে বাবা-মার টেনশন কমে।

গুড সাজেশান।মিতিন মুচকি হেসে খুদে টেলিফোনটা বের করল।স্ক্রিনে চোখ রেখে হাসি মিলিয়ে গেছে, এই যাহ, নেটওয়ার্ক তো নেই!

তা হলে?

নো প্রবলেম, ল্যান্ড লাইন তো আছে।মিতিন কাঁধে ওড়না ঝুলিয়ে নিল, আয় টুপুর।

কম্পাউন্ডের মাঝের ক্লাববাড়িটা বেশ বড়সড়।সামনে সুদৃশ্য বাগান।ক্লাবের হলঘরে এই দুপুরেও টেটেনিস পেটাচ্ছে দুটো অল্পবয়সি ছেলে, টুং-টাং-টাক আওয়াজ ভাসছে বাতাসে। সরু বারান্দার লাগোয়া অফিসরুমটায় এল মিতিন আর টুপুর। এক মধ্যবয়সি একা বসে ঢুলছিলেন, তাঁর অনুমতি নিয়ে প্রথমে হোটেলে ফোন।হা, ক্রেডিট কার্ড যথাস্থানেই আছে, ব্যাগ চেক করে বললেন হোটেল ম্যানেজার।মিতিনও তাঁকে জানিয়ে দিল সুনীল এলে ব্যাগটা যেন তার হাতে সমর্পণ করা হয়।

এবার সুনীলের মোবাইল নম্বর।অফিসে ছিল সুনীল, তার সঙ্গে কথা বলতে বলতে মিতিনের ভুরু জড়ো হয়েছে হঠাৎ।কান থেকে ফোন যখন সরাল, কপালে স্পষ্ট বিস্ময়ের ছাপ।

টুপুর উৎসুক মুখে জিজ্ঞেস করল, কী হল গো? কী বলল সুনীলদাদা?

একটা খুব খারাপ খবর শোনাল।

কী?

সিনাগগের টিকিট কাউন্টারের ছেলেটাকে মনে আছে? সেই ভিতু-ভিতু মতো? সতীশ মেননের সামনে এসে যে তোতলাচ্ছিল?

হ্যাঁ।

ছেলেটা কাল রাতে খুন হয়েছে।

.

০৫.

খাবার টেবিলে বিশেষ কথা বলছিল না মিতিন। যেন একটু অন্যমনস্ক। বেয়ারা টেবিলে খাবার সাজিয়ে দিয়েছে, তাকাচ্ছেই না সেদিকে।

চিকেন ফ্রায়েড রাইসের ধূমায়িত পাত্রখানা মিতিনকে বাড়িয়ে দিয়ে পার্থ বলল, নাও, শুরু করো।

হুঁ।

তোমাদের জন্য ওই মাছ ভাজাটাও বলে দিয়েছি।ওই যে, কী যেন একটা বিটকেল নাম?

টুপুর বলল, ক্যারিমিন পল্লিচাথু?

বেড়ে মেমারি তো তোর।এবার টেস্ট করে দ্যাখ বাড়ি আর হোটেলের প্রিপারেশানে কতটা তফাত.. আর কিছু নিবি? চিকেন-মাটনের কোনও সাইড ডিশ?

চাইনিজ ফুডের সঙ্গে মোগলাই পাঞ্চ করবে? তা হলে মাটন কড়াই নেওয়া যেতে পারে।নাকি অন্য কিছু বলব, মিতিনমাসি?

চামচ করে প্লেটে ফ্রায়েড রাইস নিচ্ছিল মিতিন।মুখ না তুলেই বলল, তোর মা-বাবাকে জিজ্ঞেস কর।

তোর কী হল বল তো? সহেলি ভুরু কুঁচকোলেন, কোথায় সিনাগগে একটা মার্ডার হয়েছে, তার জন্য তুই উতলা হবি কেন?

উতলা নয়, ভাবছি।ছেলেটা তা হলে গ্রেট স্ক্রল চুরির সঙ্গে জড়িত ছিল?

তাতেই বা তোর কী?

খানিকটা দায় তো আমাদের আছেই দিদি। আমরা যদি গ্রেট স্ক্রল দেখার জন্য বায়না না জুড়তাম, ছেলেটাকে তা হলে মরতে হত না।

এটা তুমি জোর দিয়ে বলতে পারো না।পার্থ প্রতিবাদ জুড়ল, কাল না হলেও নেক্সট শনিবার প্রার্থনার সময়ে চুরি তো আবিষ্কার হতই। তখনও তো ছেলেটা খুন হতে পারত। কিম্বা হয়তো সপ্তাহের মাঝখানেই ছেলেটাকে...।পুলিশ তখন চুল ছিঁড়ত, কেন হল, কেন হল...! পরে চুরিটা জানাজানি হলে হয়তো টের পেত কারণটা।মোদ্দা কথা, যারা ছেলেটাকে দিয়ে কাজটা করিয়েছে, তারা ওকে সরিয়ে দিতই।আজ না হোক কাল।যাতে জেরার মুখে দুষ্কর্মের পাণ্ডাটির নাম ফাঁস না হয়ে যায়।

খলনায়কটি কে হতে পারে মিতিন? অবনী এক টুকরো শশা মুখে পুরলেন, নিশ্চয়ই জু টাউনেরই কেউ?

আমার তো সাইমন লোকটাকেও সন্দেহ হয়।সহেলি বললেন, রক্ষকই হয়তো ভক্ষক।

জোস হ্যালেগুয়াকেই বা বাদ দিচ্ছেন কেন? কটা চামচে চিলি প্রন গাঁথতে-গাঁথতে পার্থ ফুট কাটল, তাঁর ঘর থেকে চাবির ছাপ তুলে আনা হল, অথচ তিনি কিছুই জানেন না? ব্যাপারটা যেন কেমন-কেমন ঠেকছে না?

যাই বলো, আমার কিন্তু ধারণা সরষের মধ্যে ভূত যদি থাকেই, সে ওই সাইমন।ভদ্রলোক কাল বলছিলেন না, সন্ধেবেলা কাকে যেন মিট করতে যাবেন? দ্যাখো গে যাও, চোরের দলের সর্দারের সঙ্গেই হয়তো আপয়েন্টমেন্ট ছিল! সাইমনের পক্ষেই তো জোস হ্যালেগুয়ার চাবি থেকে ছাপ তোলা সবচেয়ে বেশি সহজ কাজ।নয় কী?

তোমরা কিন্তু গোড়াতেই ভুল করছ।এতক্ষণ পর মুখ খুলেছে।মিতিন, জোস বা সাইমন অপকর্মে জড়িত নন, কিম্বা তাদের কারও সঙ্গে কোনও কালপ্রিটের আঁতাত নেই, একথা আমি জোর দিয়ে বলব না।তবে কিছু কিছু খটকা তো থেকেই যায়।

যেমন?

প্রথম সাইমনকেই ধরে।গ্রেট স্ক্রল হাওয়া হয়ে গেছে জেনেও সাইমন আমাদের গ্রেট স্ক্রল দেখাতে রাজি হলেন কেন? কোনও বাধ্যবাধকতা তো ছিল না, স্বচ্ছন্দে তিনি আমাদের হাঁকিয়ে দিতে পারতেন।আর মিস্টার

হ্যালেগুয়া? দেখেছই তো, তিনি কেমন আলাভোলা মানুষ, দরজা সর্বক্ষণই হাট করে খোলা রাখেন। তাঁর বাড়ি থেকে চাবির ছাঁচ তোলা তো নেহাতই ছেলেখেলা। যে কেউ করতে পারে। মিস্টার হ্যালেগুয়ারও যদি চুরির মতলব থাকে, তিনি ডুপ্লিকেট চাবি বানাতে যাবেন কেন? আসল চাবিই তো তার কাছে মজুত।

টুপুর বলল, সবাইকে বিভ্রান্তিতে ফেলার জন্য ওটাই হয়তো মিস্টার হ্যালেগুয়ার চাল?

ভুল করছিস। মিস্টার হ্যালেগুয়ার হেফাজতে বহুকাল ধরে দেওয়ালসিন্দুক রয়েছে, গ্রেট স্ক্রল সরানোর হলে তিনি তো কবেই সরাতে পারতেন। তর্কের খাতিরে যদি ধরেও নিই বুড়ো বয়সে মিস্টার হ্যালেগুয়ার মতিভ্রম হয়েছিল, মোটা টাকার টোপ খেয়ে দুষ্কর্মটিতে তিনি নিজেকে জড়িয়ে ফেলেছেন... তা হলেও প্রশ্ন থেকে যায়। কাউন্টারের ছেলেটার সঙ্গে তিনি সাঁট করবেন কেন? গ্রেট স্ক্রল হাপিশ করার পক্ষে তিনি একাই কি যথেষ্ট নন?

এমন তো হতে পারে, ছেলেটা ঘটনাচক্রে মিস্টার হ্যালেগুয়াকে গ্রেট স্ক্রল সরাতে দেখে ফেলেছিল?

তা হলে তো তখনই খুন করাতেন। চুরি ধরা পড়া অবধি অপেক্ষা করবেন কেন? অবশ্য যদি ধরেই নিই মিস্টার হ্যালেগুয়া একজন ভয়ংকর মানুষ, যিনি নরহত্যা পর্যন্ত করতে পারেন। ফ্রাঙ্কলি বলছি, বৃদ্ধ পুরোহিতটিকে দেখে আমার কিন্তু মোটেই সেরকম মনে হয়নি। সবচেয়ে বড় কথা, সাইমনের যুক্তিটা তো মিস্টার হ্যালেগুয়ার ক্ষেত্রেও খাটে। জিনিসটা উধাও জেনেও তিনি আমাদের সিনাগগে নিয়ে গেলেন কেন? তাড়াতাড়ি চুরি ধরা পড়ায় তার কী উদ্দেশ্য সাধিত হয়েছে? একমাত্র তোদের সন্দেহের তির তার দিকে যাওয়া ছাড়া?

অর্থাৎ তুমি বলতে চাও সাইমন পেরেজ বা জোস হ্যালেগুয়া চুরিতে নেই?

সম্ভাবনা অত্যন্ত কম। মিতিন একঢোক জল খেল। ভিনিগারে ভেজানো লঙ্কার কুচি মুখে ফেলে বলল, আগেও বলেছি, এখনও বলছি, নাটের গুরুটি বাইরের কেউ। তবে শুধু যে সাক্ষ্য লোপের জন্য খুনটা হয়েছে, এ আমি পুরোপুরি মানতে পারছি না। চুরি যখন শনিবারই হয়েছে, তখন ছেলেটাকে আরও একটা দিন বাঁচিয়ে রাখার কী অর্থ? নৃশংস লোকটা চোরাই মাল হস্তগত হলেই ছেলেটাকে সাবাড় করবে, এটাই তো স্বাভাবিক ছিল। কেন করেনি সেটাই ভাবছি।

অত ভাবাভাবির দরকারটা কী? সহেলির স্বরে বিরক্তি, এদিকে আমি যে কত বড় বিপদে পড়লাম সে নিয়ে তো কারও হুঁশ নেই!

একসঙ্গে সব কটা চোখ আছড়ে পড়ল সহেলির ওপর, বিপদ? তোমার?

নয়তো কী। টুপুরের বাবা তো ক্রেডিট কার্ড ফেলে এলেন, এখন আমার চলবে কী করে? ওই কার্ডের ভরসাতেই তো বেশি ক্যাশ টাকা সঙ্গে আনিনি!

এই ব্যাপার? পার্থ হো-হো হাসল, আমরা তো আছি। কিনুন না যা খুশি।

ভরসা দিচ্ছ?

সিওর।

আমার কিন্তু ভাল দেখে একটা কথাকলির মুখোশ চাই। সহেলির মুখ হাসিতে ভরে গেল, যেখানেই দেখতে পাব কিনে নেব।

শখের বলিহারি! অবনী কুটুস ফুট কাটলেন, মুখোশ পরে নাচবে নাকি?

এই তো পণ্ডিতির নমুনা! অবনীর দিকে আগুনে দৃষ্টি হানলেন সহেলি, কথাকলি ডান্সাররা মোটেই মুখোশ পরে নাচে না। মাথায় একটা জবরজং মুখোশ চাপায়, আর মুখ এঁকে নেয় মুখোশের ঢঙে। মুখোশ যেটা পাওয়া যায়, সেটা ফর শো।সাজানোর জন্যে।

ফ্ল্যাটের দেওয়ালগুলোর ওপর একটু দয়ামায়া তো করো।তোমার সাজের ভারে ওরা যে এবার খসে পড়বে।

অবনীর বলার ভঙ্গিতে হেসে উঠল গোটা টেবিল। এক লহমায় পরিবেশ ফুরফুরে। ওয়েটারকে ডেকে অর্ডার দেওয়া হল মাটন কড়াই-এর, ক্যারিমিন পল্লিচাথুও এসে গেল, খাচ্ছে সবাই মনোযোগ সহকারে।

মাছভাজা মুখে পুরে বাইরেটা দেখছিল টুপুর। রেস্তোরাঁর কাচের জানলা দিয়ে। ছোট হলেও মুন্নার বেশ জমজমাট শহর। বিশেষত শহরের এই মধ্যমণি অঞ্চলটা। বাড়িঘর দেখে ঠাহর হয় এলাকাটা পুরনো। এদিকটায় দোকানপাট আছে অজস্র, হোটেলের সংখ্যাও নেহাত কম নয়।সরু একটা নালামতো চলে গেছে শহরের মধ্যিখান দিয়ে। ওটা নালা? না নদী? বর্ষায় ওরই চেহারা হয়তো ফুলেফেঁপে ওঠে! অদূরে চা-বাগানও দৃশ্যমান।এত চা হয় নীলগিরি রেঞ্জে?

ভাবনার মাঝেই কনুইয়ের খোঁচা, আই দিদিভাই দ্যাখ, সেই দুষ্টু লোকগুলো!

কারা?

ওই যে ফলসের ধারে এসেছিল!

ওমা, তাই তো! সেই দুই মূর্তিমানই তো! ঢুকেছে রেস্তোরায়। হেলেদুলে কোনার টেবিলে গিয়ে বসল। তাকাচ্ছে এপাশ-পাশে।টুপুরের সঙ্গে চোখাচোখি হতেই চোয়াল ফাঁক করল গুঁফোটা।সঙ্গে সঙ্গে চোখ সরিয়ে নিয়েছে টুপুর।চাপা গলায় মিতিনকে বলল, কী বিচ্ছিরি ভিলেনের মতো হাসছে দ্যাখো!

আমল দিস না।খা।

পার্থরও নজর গেছে।বলল, আশ্চর্য, বেছে বেছে এখানেই এল?

সহেলি শঙ্কিত মুখে বললেন, আর এখানে থাকতে হবে না।উঠে পড়ো।

আহ, বাড়াবাড়ি কোরো না। মিতিন মৃদু ধমক দিল, নির্জন জায়গায় যখন অ্যাটাক করেনি, এত লোকের মাঝে কীসের বিপদ?

তবু যেন ঠিক আশ্বস্ত হওয়া গেল না। সকলেই আড়ে-আড়ে দেখছে। তন্দুরি চিকেন নিয়েছে লোকদুটো, তামসিক ভঙ্গিতে কচরকচর চিবোচ্ছে মুরগির ঠ্যাং।টুপুররা যখন বিল মিটিয়ে বেরিয়ে এল, তখন নতুন করে কী যেন অর্ডার করছে দুজনে।

রেস্তোরার উলটো দিকে গাড়ি রেখেছে ম্যাথু।সহেলি সিটে বসে বললেন, ওফ, ভয়ে-ভয়ে বেশি খাওয়া হয়ে গেল।এখন একটা পান পেলে ভাল হত।

খাবেন পান? পার্থ বলল, তবে এখানে বোধ হয় বাংলার পান মিলবে না।দক্ষিণী পান চলবে?

চলবে, চলবে। আমি সাউথ ইন্ডিয়ান পান খেয়েছি। কলকাতাতেও পাওয়া যায়। গোল-গোল করে সাজে, ওপরে একটু নারকোল ছড়িয়ে দেয়...

টুপুর বলল, আমিও একটা সাউথ ইন্ডিয়ান পান খাব।

বুমবুম বলল, আমিও।

আয় তবে।

দোকানে এসে এক প্যাকেট সিগারেট কিনল পার্থ।পান সাজাই ছিল, ভরে নিয়েছে ঠোঙায়।সিগারেট ধরিয়ে ধোঁয়া ছেড়ে বলল, তোদের আর কিছু চাই?

বুমবুমের একটাই চাহিদা।চিপস।

টুপুর বলল, গোটাকতক চিকলেট নিতে পারো।

এনিথিং মোর?

নাথিং... আমরা কি এখন হোটলে ফিরছি, পার্থমেসো?

চাইলে খানিক বেড়াতেও পারি।একেবারে সন্ধেবেলা গিয়ে ঢুকব।

এখানে কী কী দ্রষ্টব্য আছে?

কাছাকাছির মধ্যে সাইট বলতে এরাভিকুলম ন্যাশনাল পার্ক... আনাইমুড়ি পাহাড়.. জানিস তো, আনাইমুড়ি সাউথ ইন্ডিয়ার হাইয়েস্ট পিক।প্রায় দুহাজার সাতশো মিটার উঁচু।

মাত্র? হিমালয়ের চূড়াগুলোর কাছে এ তো নস্যি গো!

কী আর করা, এরা যে আর বাড়েনি।তবে মনে রাখিস, আনাইমুড়ির বয়স কিন্তু হিমালয়ের চেয়ে অনেক বেশি।

তা ওই বুড়ো পাহাড়ে চড়া যায়?

শুনেছি ট্রেক করতে হয়।অনেকটা সময় লাগে।তোর মা থোড়াই পারবে।...আর-একটা সাইটও আছে কাছেপিঠে।মাটুপেট্টি ড্যাম।

হঠাৎই পিছন থেকে কে যেন বলে উঠল, দ্যাটস আ ওয়ান্ডারফুল প্লেস।ডোন্ট মিস ইট।

চমকে ঘাড় ঘোরাল টুপুর।এক ভদ্রলোক হাসছেন মিটিমিটি।পরনে জিনস, ডেনিম জ্যাকেট, কাঁধে বিদেশি ক্যামেরা, পায়ে থ্যাবড়া শু।হাইট খুব বেশি নয়, দোহারা চেহারা, মাথায়।আফ্রিকানদের মধ্যে চাপ চাপ কোঁকড়া চুল ও জোড়া ভুরু, গায়ের রং না ফরসা না কালো।দেখে মনে হয় পার্থমেসোরই বয়সি।

হাসি বিস্তৃত করে ভদ্রলোক বললেন, আমি ওল্পো-ওল্পো বাংলা জানে।সুইট ল্যাঙ্গুয়েজ।আর ইউ ফ্রম ক্যাল?

পার্থ ইংরেজিতেই জবাব দিল, হা, আমরা কলকাতারই বাসিন্দা।আপনি?

আমি পি কে জি কুরুপ, ঝরঝরে ইংরেজিতে বললেন ভদ্রলোক, থাকি কাসারগড়।নাম শুনেছেন নিশ্চয়ই কাসারগড়ের?

উত্তর কেরলে?

একদম ঠিক।এক সময় কিছুদিন পশ্চিমবঙ্গে ছিলাম।তখনই আপনাদের ভাষা সামান্য শিখেছি।

চাকরি সূত্রে গিয়েছিলেন?

আমি কারও গোলামি করি না মশাই।বাপ-ঠাকুরদার চায়ের ব্যবসা আছে, সেটাই একটু-আধটু দেখাশুনো করি আর কী।তবে আসল কাজ বনে-জঙ্গলে টোটো করে বেড়ানো।চোখ টিপলেন পি কে জি কুরুপ, ওয়াইল্ড লাইফ ফোটোগ্রাফি আমার নেশা।সেই সুবাদেই আপনাদের ডুয়ার্স রেঞ্জে গেছি।সুন্দরবনেও ঘুরেছি।আহা, ওই ম্যানগ্রোভ ফরেস্ট এখনও আমার চোখে ভাসে।... আপনারা নিশ্চয়ই টুরিস্ট?

দু-পাঁচ মিনিটের মধ্যে আলাপ জমে গেল।পার্থর সঙ্গে সঙ্গে রাস্তার এপারে এসে অবনী, মিতিন, সহেলির সঙ্গে পরিচয় করলেন কুরুপ।কাসারগড় থেকে একাই গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে পড়েছেন তিনি।পালাক্কাড় জেলার সাইলেন্ট ভ্যালিতে নাকি ছিলেন বেশ কয়েক দিন, সবে কালই এসে পৌঁছেছেন মুন্নার।এ জায়গাটা তাঁর ভালই চেনা, বার ছ-সাত এসেছেন, এবার উঠেছেন হোটেল ক্রিস্টাল প্যালেসে।ইচ্ছে আছে আরও দু-একটা জঙ্গল ঘুরে ফিরবেন বাড়ি।ব্যাচেলর মানুষ, ঘরের প্রতি তেমন টানও নেই তার।ব্যবসাটাও মূলত দাদা আর ভাই সামলান, তিনি না থাকলেও কারবার ঠিকঠাকই চলে।

কথায় কথায় কুরুপ জিজ্ঞেস করলেন, তা আপনারা উঠেছেন কোথায়?

পার্থই বলল, মুন্নার ক্লাব।

আমিও একবার ওখানে ছিলাম।পজিশনটা খুব সুন্দর।গোটা উপত্যকার চমৎকার ভিউ পাওয়া যায়।কোন ঘরগুলো নিয়েছেন? উপরের? না নীচের?

নীচেই তো পেলাম।

উপরেরটা পেলে আরও উপভোগ করতেন।চারপাশে গাছপালা, নির্জন বেশ একটা জঙ্গল-জঙ্গল এফেক্ট আছে।

আমার দিদির অসুবিধে হত।মিতিন বলে উঠল, ঢাল বেয়ে ওঠানামা করা, তার উপর ভাঙা-ভাঙা পাথরের সিঁড়ি

আমার গিন্নির একটু ভূতের ভয়ও আছে।অবনী মন্তব্য জুড়লেন, বেশি নির্জনতা উনি পছন্দ করেন না।

নির্জনতাই তো মুন্নারের আসল সৌন্দর্য।এই নির্জনতার টানেই তো আমার বারবার মুন্নার আসা।পুরনো টাউনটা ছেড়ে ফাঁকা-ফাঁকা জায়গায় থাকি।তা আপনারা থাকছেন কদিন?

আজকের রাতটাই।কাল এদিকটা ঘুরেফিরে দেখে পেরিয়ার চলে যাব।

আমিও তো পেরিয়ার যাচ্ছি।তবে কাল খুব ভোরে বেরিয়ে পড়ব।ইডুক্কির জঙ্গল হয়ে সোজা যাব থেকাড়ি। বলে একটু থামলেন কুরুপ।তারপর বললেন, আজ বিকেলে বেড়ানোর জন্য আপনাদের একটা বিউটিফুল স্পট সাজেস্ট করতে পারি।কাছেই একটা চা-বাগান আছে।দুটো পাহাড়ের মধ্যিখানে লেকের চারপাশ ঘিরে চা-গাছ, দেখে মন ভরে যাবে।

সহেলি ফস করে বললেন, এখানে কোনও মন্দির-টন্দির নেই?

মুন্নার নামটাই তো হয়েছে মুন্নার দেবীর নাম থেকে।এখানে মন্দির থাকবে না? ওই তো, সামনেই।তবে ওই টেম্পল দেখে সুখ নেই।স্থাপত্য সাদামাঠা, তেমন কারুকাজও নেই, সাইজেও ছোট্ট।

তা হোক, তবু একবার মন্দির দর্শন করা উচিত।

কুন্দালে চা-বাগানে কিন্তু অবশ্যই যাবেন।কুরুপ পায়ে-পায়ে এগোলেন খানিক তফাতে রাখা সাদা মারুতির দিকে।গাড়ির দরজা খুলতে খুলতে বললেন, এখন আসি।কপালে থাকলে কাল আবার পেরিয়ারে দেখা হবে। পারলে মুন্নারের গির্জাগুলো দেখে নেবেন।পুরনো আমলের যা সুন্দর-সুন্দর ঝাড়লণ্ঠন আছে।

টুপুরদের হাত নেড়ে, নিজেই গাড়ি চালিয়ে সামনে দিয়ে বেরিয়ে গেলেন কুরুপ।মারুতির সাদা রং যথেষ্ট ময়লা।বোঝা যায় গাড়ি নিয়ে ভদ্রলোক ঘুরছেন খুব, ধোওয়া-মোছা হচ্ছে না বেশ কিছু দিন।

গাড়িটা দৃষ্টিসীমার বাইরে চলে যাওয়ার পর পার্থ বলল, ভদ্রলোক কিন্তু খুব ইন্টারেস্টিং।পাক্কা বোহেমিয়ান।

সহেলি বললেন, জঙ্গলে-জঙ্গলে ঘুরে মানুষ কী যে আনন্দ পায় কে জানে!

অবনী বললেন, মার্কেটিং করেও যে মানুষের কী পুলক জাগে কে জানে!

এবার কিন্তু তুমি আমায় টিজ করছ?

টিজ কোথায় করলাম? এক-একটা মানুষের কেমন এক-একটা নেচার, তাই বলছি।

টুকটাক ঠোকাঠুকি চলছে, তার মধ্যেই ম্যাথু গাড়িতে স্টার্ট দিল।পার্থর নির্দেশ মতো চলেছে কুন্দালের পথে। পাহাড়ি রাস্তার দুধারে চা বাগান আর চা-বাগান।বাগিচার মাঝে-মাঝে রেন-ট্রি।সবুজে সবুজে ভারী আরাম হচ্ছিল চোখের।

জানলা দিয়ে তাকিয়ে থাকতে-থাকতে টুপুর আপ্লুত স্বরে বলে উঠল, এখানকার পাহাড়গুলো সত্যিই আমায় অবাক করেছে মিতিনমাসি।দার্জিলিং আর অসম ছাড়া ভারতের আর কোথাও যে এত চা হতে পারে, এ আমার ধারণায় ছিল না।

এ হল ব্রিটিশদের হাতযশ, বুঝলি।এই কেরলে প্রাচীনকাল থেকে বিদেশি তো কম আসেনি।চিন, মিশর, গ্রিস, রোম, ফিনিশিয়া, আসিরিয়া কোত্থেকে না এসেছে ব্যবসায়ীরা। বাষ্পযান আবিষ্কার হওয়ার পর ইউরোপিয়ানরা আসতে শুরু করল কেরলে।পর্তুগিজ, দিনেমার, ওলন্দাজ, ফরাসি ... ব্রিটিশরা এল সবার শেষে। কেরলে প্রথম তারা কলোনি গড়েছিল ষোলোসো চুরাশিতে। ত্রিবান্দ্রাম, মানে যাকে এখন থিরুবনন্তপুরম বলে, তারই কাছে।আত্তিংগলের রানির দেওয়া জমিতে।পরে এসেও তারাই কিন্তু এ দেশের অধীশ্বর বনে গেল।টিপু সুলতানকে হারাল সতেরোশো বিরানব্বইতে, পেয়ে গেল মালাবার আর কোচি।আর তারপর থেকেই এখানকার মাটিকে তারা কাজে লাগাতে শুরু করল। মশলা তো কেরলে চিরকালই হত, ব্রিটিশরা আনল পাহাড়ে চাষ। কোথাও চা, কোথাও কফি, আর পাহাড় সমুদ্রের মাঝামাঝি অঞ্চলে রবার। নীলগিরি রেঞ্জ জুড়ে শুধুই দেখবি প্ল্যানটেশন আর প্ল্যানটেশন।শুধু কেরল নয়, তামিলনাড়ুরও বেশ খানিকটা আছে এর মধ্যে।এ সবই কিন্তু ব্রিটিশদের অবদান।

অবনী শুনছিলেন মন দিয়ে। বললেন, কেরলের হিস্ট্রিটাই পিকিউলিয়ার। ভারতের এখানেই প্রথম গির্জা, এখানেই প্রথম মসজিদ, এখানেই প্রথম সিনাগগ

পার্থ জিজ্ঞেস করল, আচ্ছা, যিশুর ডাইরেক্ট শিষ্য সেন্ট টমাস নাকি কেরলে এসেছিলেন?

হুঁ। মালাবার উপকূলে। সালটা ছিল বাহান্ন এ ডি। কোচির কাছে ক্রাংগানোর বলে একটা বন্দর আছে, সেখানে।

তার মানে খ্রিস্টানরাও এ দেশে দুহাজার বছরের পুরনো?

অবশ্যই।তাই তো বলি এ দেশ হিন্দু, মুসলমান, খ্রিস্টান কারও একার নয়, সকলের।

এক পাহাড়ি বাঁকে গাড়ি থামিয়েছে ম্যাথু। বাঁয়ে কুন্দালে টি গার্ডেনের বোর্ড। দূরে, খানিক নীচে দেখা যায় এক স্নিগ্ধ শান্ত হ্রদ। নামতে নামতে হ্রদের পাড় অবধি পৌঁছে গেছে চা-বাগান। ম্যাথু মাথা দুলিয়ে বলল, ইউ গো। আই ওয়েট হিয়ার। চড়া রঙের শাড়ি জামা নিজস্ব কায়দায় পরে চা বাগানে কাজ করছে কেরলীয় মেয়েরা। টকাটক দুটো পাতা একটি কুঁড়ি ছিঁড়ছে গাছ থেকে, রাখছে হাতের ঝুড়িতে। টুপুরদের দেখে মিষ্টি করে হাসল তারা। হাত নাড়ছে। তরতরিয়ে হ্রদের পাড় অবধি নেমে গেল বুমবুম আর টুপুর। হ্রদের কাকচক্ষু জলে ছায়া পড়েছে মেঘের, দৃশ্যটা যে কী নয়নাভিরাম। সহেলি পর্যন্ত স্বীকার করলেন কেরলে। বেড়াতে আসা তার সার্থক হল।

পাহাড়ে অন্ধকার নামে ঝুপ করে, তাই বেশিক্ষণ আর থাকা হল না কুন্দালে। ফিরছে টয়োটা কোয়ালিস। পথে গাড়ি দাঁড় করিয়ে চা খাওয়া হল একপ্রস্থ। হোটেলে যাওয়ার আগে টুকুস করে মুন্নার দেবীর মন্দিরে ঢু মেরে নিলেন সহেলি। এসবের ফাঁকেই মুন্নারে একটা সুন্দর সন্ধে নেমে গেছে। মুন্নার ক্লাবে যখন পৌঁছল টুপুররা, তখন তো রীতিমতো ঘুটঘুট করছে অন্ধকার।

গাড়ি থেকে নেমে আগে-আগে যাচ্ছিল টুপুর। কেয়ারি করা বাগানের মধ্যিখানের সরু বাঁধানো পথ ধরে। ক্লাবরুমের কাছাকাছি এসে হঠাৎই বুক ধড়াস।

সেই লোকদুটো বসে আছে চেয়ারে। ক্লাবের লম্বা টানা ছায়াছায়া বারান্দায়।

টুপুরকে দেখে তড়াং উঠে দাঁড়াল যুগলে। গুঁফো আর টাকমাথা কোরাসে বলে উঠল, নমস্তে। নমস্তে।

কী কাণ্ড, লোকদুটো এখানেই উঠেছে নাকি!

.

০৬.

সিঙ্গল চৌকিটায় মিতিন যোগব্যায়াম সারছিল। ভুজঙ্গাসন, শলভাসন, ময়ূরাসন, মৎস্যাসন করল মিনিট পনেরো, তারপর শবাসন। তারপর প্রাণায়াম। পালা করে পূরক, কুম্ভক, রেচক। কোনটা কতক্ষণ করবে জানে টুপুর। ওয়ান ইজ টু ফোর ইজ টু টু। চেয়ারে বসে টুপুর ঘড়ি দেখছিল। দশ সেকেন্ড ধরে এক নাক চেপে শ্বাস টানা, চল্লিশ সেকেন্ড দম বন্ধ, তার পর অন্য নাক দিয়ে বিশ সেকেন্ড ধরে ফুসফুস খালি করা। চেষ্টা করে দেখেছে টুপুর, ওই রেচকটা নিয়েই সমস্যা হয়। অতক্ষণ ধরে একটু-একটু করে শ্বাস ফেলা যে কী কঠিন। আবার এ নাক দিয়ে একবার টানতে হবে, তো পরের বার ও নাক দিয়ে। রীতিমতো আয়াসসাধ্য ব্যাপার। তবে মিতিনমাসি করে ভারী সহজ ভাবে। মনে হয় যেন তার কাছে এসব ছেলেখেলা। এর পর চোখ বন্ধ করে দশ মিনিট ধ্যান। মিতিনমাসি বলে এই ধ্যানটা নাকি মস্তিষ্কের জন্য খুব জরুরি। এতে নাকি মনঃসংযোগের ক্ষমতা বাড়ে।

শরীরচর্চা শেষ করে চোখ খুলল মিতিন। হাতের তালু চোখের উপর আলতো বোলাতে-বোলাতে বলল, কী রে, দিদি ভরসন্ধেবেলা ঘুমিয়ে পড়ল নাকি?

আজ্ঞে না। বড় চৌকিতে নিশ্চুপ শুয়ে থাকা সহেলি খরখর করে উঠলেন, আমি শুধু চোখ বুজে ভাবছি তোমাদের আক্কেলের কথা। তুমি এখানে হাত-পা বেঁকাচ্ছ, ওদিকে দুজন দাবা নিয়ে বসে গেছেন মাথার উপর যে খাড়া ঝুলছে, সে খেয়ালটি নেই!

কীসের খাড়া?

দরজা-জানলা সব বন্ধ, তবু গলা অস্বাভাবিক নামিয়ে প্রায় ফিসফিস করে সহেলি বললেন, গুন্ডাদুটো ধাওয়া করে এখানে পর্যন্ত এসে গেল এখন আমরা কী করব?

নাকে সরষের তেল দিয়ে ঘুমোও।অযথা প্যানিক কোরো না।এখনও পর্যন্ত ওরা তোমার কোন পাকা ধানে মই দিয়েছে?

দিতে কতক্ষণ? মিতিন, এখনও সময় আছে, চল, অন্য হোটেলে চলে যাই।

এখন? খেপেছ? তুমি আবার পাশ ফিরে শুয়ে পড়ো।মিতিন চৌকি থেকে নেমে গায়ে একখানা শাল জড়িয়ে নিল।দিনেরবেলা টের পাওয়া যায়নি, তবে সূর্য ডোবার পর বেশ ঠান্ডা হয়ে গেছে আবহাওয়া।অ্যান্টিরুমে গিয়ে সুটকেস খুলে বুমবুমের জন্য একটা হাফ সোয়েটার বার করতে করতে বলল, তুইও গায়ে একটা কিছু চাপিয়ে নে টুপুর।চোরা ঠান্ডা একবার লেগে গেলে আর রক্ষে নেই।

টুপুরেরও একটু শীতশীত করছিল বটে।তবু বলল, ধুত, শাল তো সুটকেসের তলায়।কে এখন টেনে-টেনে বের করবে?

তোদের সুটকেসের চাবি দে।আমি বের করে দিচ্ছি।

সব জিনিসপত্র রাখা হয়েছে এক জায়গায়।এ ঘরের অ্যান্টিরুমে।টুপুর, সহেলি দুজনের জন্যই দুটো গরম চাদর বের করল মিতিন।টুপুরকে বলল, বুমবুমকে ডাক তো।সোয়েটারটা পরিয়ে দিই।

পাশের ঘরে এসে টুপুর থতমত।নিবিষ্ট মনে দাবা খেলছে দুই মহারথী, বুমবুম নেই।

ভুরু কুঁচকে টুপুর জিজ্ঞেস করল, ও মেসো, বুমবুম কোথায়?

পার্থ বিড়বিড় করে বলল, দাঁড়া, গজটাকে ধরেছে।

অবনী গর্বিত মুখে বললেন, ওটা গেছে ভ্লাদিমির।হাতি বাঁচাতে গেলে তোমায় একটা বোড়ে স্যাক্রিফাইস করতে হবে।

অত সোজা নয় গ্যারি।এবার আপনি আমার ঘোড়ার কেরামতি দেখবেন।আড়াই পা লাফিয়ে আপনার নৌকোকে অ্যাইসান চাঁট ঝাড়বে...

টুপুর ব্যাকুল স্বরে বলল, ও বাবা, ও মেসো, খেলাটা একটু থামাও না।

অবনী মুখ তুললেন, কেন?

বুমবুমকে দেখছি না যে!

এই তো ছিল।পার্থ চোখ না তুলে বলল, তোদের ঘরে গেছে বোধ হয়।

না।আমি তো ওঘর থেকেই এলাম।

তা হলে হয়তো বাথরুমে।

দৌড়ে টয়লেটে উঁকি মেরে এল টুপুর।নাহ, বুমবুম সেখানেও নেই।

ব্যস, হুলুস্থুল বেধে গেল।মিতিন দৌড়ে লনে নেমে অন্ধকারে খুঁজছে এদিক-ওদিক।পার্থ ছুটে গাড়ির কাছটা দেখে এল, অবনী ক্লাবঘর।উঁহু, ক্লাবঘর, লন, রসুইখানা, গাড়ি, বুমবুম কোথাও নেই।ম্যাথু ক্লাবরুমে বসে টিভি দেখছিল, সেও হন্তদন্ত হয়ে বেরিয়ে পড়েছে খুঁজতে।জনাচার-পাঁচ ভদ্রলোক ছিলেন ক্লাবে, তারাও শশব্যস্ত।উলটো দিকের রুমের তামিল পরিবারটিও দরজা খুলে ঘাবড়ানো মুখে উঁকিঝুঁকি মারছে।

একজন বললেন, বাচ্চা রাস্তায় বেরিয়ে যায়নি তো?

সহেলি হাউমাউ কেঁদে উঠলেন, কক্ষনো না। ওই লোকদুটোই ধরে নিয়ে গেছে। আমি জানতাম আমি জানতাম এরকম কিছু একটা ঘটবে!

কে লোক? কেয়ারটেকার প্রশ্ন করল, কাদের কথা বলছেন?

ওই যে, উপরের ঘরে উঠেছে।সারাদিন ধরে ওরা আমাদের ফলো করছে।

তাই নাকি? লোকদুটো ছেলেধরা?

কথা শেষ হতে না-হতে উপরের কটেজ থেকে দুমদুম দমাদম আওয়াজ।হুড়মুড় করে সবাই ছুটেছে উপরে। গিয়েই চক্ষুস্থির।লোকদুটোর দরজার ল্যাচ বাইরে থেকে টানা, ভিতর থেকে কে যেন ঘা মারছে জোর-জোর।

টুপুর পেঁচিয়ে উঠল, বুমবুম! নিশ্চয়ই বুমবুমকে আটকে রেখে গেছে!

পার্থ গিয়ে ঘ্যাচাং করে খুলে দিল ল্যাচ। সঙ্গে সঙ্গে অদ্ভুত দৃশ্য। বোধ হয় দূর থেকে ছুটে এসে দরজায় একটা মরিয়া ধাক্কা মারতে যাচ্ছিল, ঠিক সেই মুহূর্তে খুলে গেছে দ্বার।গুঁফো আর টাকমাথা তীব্র গতিতে শাঁ করে বেরিয়ে এসে আছাড় খেয়ে পড়ল মাটিতে।দুটো অতিকায় মিসাইলের মতো।

কয়েক সেকেন্ডের জন্য লোকদুটো হতভম্ব। তারপর উঠে গায়ের মাটি ঝাড়তে ঝাড়তে তাদের সে কী চিৎকার।তুবড়ি ছুটছে মলয়ালমের।ক্রোধে গরগর করছে, হাত-পা ছুড়ছে ...।অতি কষ্টে তাদের শান্ত করল কেয়ারটেকার। ইংরেজি তর্জমাতে জানা গেল লোকদুটো নাকি খেতে বেরিয়েছিল, ফেরার পর কে যেন তাদের ঘর বাইরে থেকে বন্ধ করে দিয়েছে।আর বুমবুমকে..? তারা দেখেইনি।

টুপুর নার্ভাস মুখে বলল, তা হলে বুমবুমের কী হল?

মিতিন বলল, দাঁড়া এক সেকেন্ড।দেখছি।

বলেই ঘরটার পিছনে গিয়ে হিড়হিড় করে টানতে টানতে নিয়ে এল বুমবুমকে।বলল, এই যে বাবু।পিছনের জানলায় দাঁড়িয়ে এঁদের দুর্গতি পর্যবেক্ষণ করছিলেন।ল্যাচ টানাটাও এঁরই কীর্তি।

বুমবুমের ঘাড় হেঁট। পার্থ লজ্জায় লাল। মিতিন বিনীতভাবে ক্ষমা চাইল লোকদুটোর কাছে। গুঁফো আর টাকমাথা গলল না, রক্তবর্ণ চোখে নিরীক্ষণ করছে বুমবুমকে।টুপুররা নেমে আসার পরও ঘরে ঢুকল না, সম্ভবত আবার যদি ঘরবন্দি হয় এই আশঙ্কায়।

রুমের দরজা ভেজিয়ে দিয়ে বুমবুমের ঘেঁটি পাকড়াল মিতিন। জোর ধমক লাগাল, কেন তুমি ওরকম শয়তানি করলে? কেন?

বুমবুমের মুখ কাচুমাচু।ঢোক গিলে বলল, দুষ্ঠু লোকদুটোকে আমি শাস্তি দিচ্ছিলাম।

কীসের শাস্তি?

বারে, ওরা যে আমাদের ভয় দেখাচ্ছিল।

কী ভয় দেখিয়েছে?

মাথা চুলকে বুমবুম বলল, বারে, তোমরাই তো বলছিলে।

ধন্যি সাহস ছেলের! সহেলি কপাল চাপড়াচ্ছেন, হবে না? গোয়েন্দা মাকে দেখে দেখে যা শিখছে ...

লোকদুটো কিন্তু বেজায় খেপেছে।অবনী বললেন, একটা বাচ্চার হাতে ওইভাবে হেনস্থা হওয়া ...!

সহেলি বললেন, একা পেলে ওরা কিন্তু বুমবুমকে ছিঁড়ে খেয়ে নেবে।

টুপুর বলল, যেভাবে ওরা মুরগি ছিঁড়ে খাচ্ছিল? টুপুরের বলার ধরনে হেসে ফেলল সবাই।

ঘরের হাওয়া লঘু হতেই গুটিগুটি নৌকো গজ সাজিয়ে বসে পড়লেন অবনী। পার্থকে ডাকলেন, কী হল, এসো।তোমার গজ সামলাও।

পার্থও দুহাতে চুল খামচে চোখ গাঁথল দাবার বোর্ডে।বলল, হচ্ছে, হচ্ছে।তাড়া কীসের।

মিতিন চোখ পাকাল, অ্যাই, এক্ষুনি মজে যেয়ো না।আগে কাজের কথাগুলো শেষ করো।

বলো।কান আছে।

রাতে খাওয়াদাওয়ার কী হবে?

বন্দোবস্ত কমপ্লিট।সন্ধেবেলা ঢোকার সময়েই ক্লাবের ক্যান্টিনে বলে দিয়েছি।প্লেন চাপাটি আর চিকেন।সার্ভ করবে কাঁটায় কাঁটায় দশটায়।ঠিক আছে?

আর কাল সকালে?

এখনই সকালের চিন্তা করতে হবে? রাতটুকু কাটতে দাও।

সকালে কিন্তু সময় পাবে না।আমরা সাতটার মধ্যে বেরোব।তখন নিশ্চয়ই এখানকার ক্যান্টিন খুলবে না?

সম্ভবত না।

তা হলে?

পথে কোথাও খেয়ে নেব।

না। পথে দাঁড়ানো মানে সময় নষ্ট। সব কিছু দেখেটেখে আমাদের কিন্তু বিকেল-বিকেল পেরিয়ার পৌঁছতে হবে।একশো দশ কিলোমিটার রাস্তা, গোটাটাই পাহাড়ি, ঘণ্টা চার-পাঁচ তো লাগবেই।

তো?

পাউরুটি-টাউরুটি এনে রাখো না।মোটামুটি তা হলে একটা হেভি ব্রেকফার্স্ট করে বেরিয়ে পড়ি।

এখন কোথায় পাউরুটি পাবে?

না পাওয়ার তো কিছু হয়নি।সবে তো আটটা বাজে।

বেরোতেই হবে? পার্থর মুখ বেজার, এই বিজন বিভুঁইয়ে রাতের অন্ধকারে।

মিতিন রাগতে গিয়েও হেসে ফেলল।টুপুরকে বলল, তোর মেসো ফেভিকলে সেঁটে গেছে।চল, আমরাই যাই। তোর মা সঙ্গে গেলে গাড়ি নেব, নয়তো পায়দল।

সহেলিও নড়তে ইচ্ছুক নন। টিভি চালিয়েছেন রুমে, এখন কী একটা হিন্দি সিরিয়াল হয়, দেখবেন। অ্যাডভেঞ্চার ক্লান্ত বুমবুমও বসে পড়ল পরদার সামনে।সহেলির গা ঘেঁষে।

আকাশে চাঁদ ওঠেনি এখনও।ঝিকমিক করছে কোটি কোটি তারা।গাঢ় নীল আকাশের মতো মুন্নার শহরটাও সেজেছে আলোর শলমা চুমকিতে।দূরেও পাহাড়ে-পাহাড়ে দেখা যায় ছোট-ছোট আলোর বিন্দু।

দেখতে দেখতে বিভোর হয়ে হাঁটছিল টুপুর। পাকদণ্ডী ধরে নেমে এল বড় রাস্তায়। টর্চ মিতিনমাসির হাতে। জ্বলছে, নিভছে।

নীচে প্রায় সব দোকানই খোলা। একটা বড়সড় স্টেশনারি দোকান থেকে কালকের রসদ কিনে ফেলল মিতিননা পাউরুটি, মাখন, জ্যাম, কলা, বিস্কুট, চানাচুর। এবং চিপস। ওটি না থাকলে বুমবুম মাথা খেয়ে ফেলবে।

দোকান থেকে বেরিয়েছে দুজনে, সামনে সকালের সেই সাদা মারুতি। ড্রাইভিং সিট থেকে ঘাড় এগিয়ে হাঁকছেন পি কে জি কুরুপ, গুড ইভনিং ম্যাডাম।

মিতিন, টুপুর গাড়ির কাছে গেল। ঠোঁটে হাসি ফুটিয়ে মিতিন বলল, ভেরি গুড ইভনিং। আপনি এদিকে কোথায়?

এই একটু দানাপানির খোঁজে বেরিয়েছিলাম। কুরুপ গাড়ি থেকে নেমে এলেন, আপনারা মাত্র দুজন কেন? বাকিরা কোথায়?

রুমে।আমরা একটু সান্ধ্যভ্রমণে বেরিয়েছি।

বাহ।তা আসুন না, গরম-গরম কফি খাই।আপত্তি আছে?

একেবারেই না।চলুন।

দু-চার পা দূরেই ভেজিটেরিয়ান রেস্টুরেন্ট। তেমন শৌখিন নয়, তবে মোটামুটি ছিমছাম। পরিচ্ছন্ন। কফির অর্ডার দিয়ে কুরুপ বসলেন গুছিয়ে।জিজ্ঞেস করলেন, গিয়েছিলেন কুন্দালে?

মিতিনের আগে টুপুরই বলে উঠল, নিশ্চয়ই।দারুণ এনজয় করেছি।

কেরল তো উপভোগ করারই জায়গা।ফ্রম নর্থ টু সাউথ কত যে ঘোরার জায়গা!

আপনাদের নর্থ কেরলেও অনেক সুন্দর-সুন্দর জায়গা আছে?

আছে তো। আমাদের বাড়ি থেকেই মাইল দশেক দূরে বেকাল ফোর্ট। সমুদ্রের পাড়ে ওরকম দুর্গ রীতিমতো দুর্লভ। বেকাল বিচটাও দেখার মতো। তারপর ধরুন কালিকট, আই মিন কোঝিকোড়। ভাস্কো-দা-গামা যেখানে প্রথম ল্যান্ড করেছিলেন।

টুপুর বলল, ভাস্কো-দা-গামা মারা তো গিয়েছিলেন কোচিতে?

হ্যাঁ।পনেরোশো চব্বিশ সালের পঁচিশে ডিসেম্বর।ফোর্ট কোচিতে।

কোচিতে দুর্গ আছে নাকি? আমরা তো দেখিনি!

মাট্টানচেরি আইল্যান্ডের উত্তর দিকে ছিল দুর্গটা।এখন তার কিছুই অবশিষ্ট নেই।কাঠের দুর্গ তো, কত কালই বা টেঁকে!

টুপুর আরও অবাক, কাঠের?

ইয়েস মিস। সেই দুর্গের নাম ছিল ম্যানুয়েল কোলাটি। ইংরেজিতে পোর্ট সেন্ট ম্যানুয়েল। তৈরি হয়েছিল পনেরোশো তিন সালে। বানিয়েছিলেন ভাস্কো-দা-গামার বন্ধু পর্তুগিজ অ্যাডমিরাল আলবুকার্ক। এই আলবুকাই কোচিতে পর্তুগিজ কলোনির পত্তন করেন।অবশ্য কোচির প্রথম ভাইসরয় হয়েছিলেন আলমিডা, হয়তো আলবুকাই ভাইসরয় হতেন, কিন্তু তিনি যে দেশে ফিরে গিয়েছিলেন।আবার আলবুকার্ক এসেছিলেন বটে, তবে তিনি আর তখন কর্তৃত্ব পাননি।

এবার মিতিনের আশ্চর্য হওয়ার পালা, আপনার তো দেখছি ইতিহাসে অগাধ ফান্ডা!

ওই একটু-আধটু পড়াশুনো করি আর কি। শখ। কুরুপ কাঁধ ঝাঁকালেন, ইতিহাস আর ওয়াইল্ড লাইফ ফোটোগ্রাফি, এই নিয়েই তো আছি।

স্টিলের গ্লাসে কফি এসে গেছে। চুমুক দিয়ে মিতিন জিজ্ঞেস করল, ওয়াইল্ড লাইফ ফোটোগ্রাফির নেশাটা ধরল কী করে?

সে এক গল্প ম্যাডাম।আমার বাবা ছিলেন চ্যাম্পিয়ন শিকারি।ঘুরে ঘুরে কতরকম শিকার যে তিনি করেছেন। তিন জাতের বেড়াল, চার ধরনের ভাল্লুক, সাত রকম হরিণ, আট রকম ছাগল, ভেড়া আর ষাঁড় তিনটে করে ভ্যারাইটির।হরিণের মধ্যে অ্যান্টিলোপও আছে, তার চামড়া ঝুলছে আমাদের বাড়ির দেওয়ালে।অসমে তিনি পাগলা হাতি মেরেছেন, রাজস্থানের রণথম্ভোরে কস্তুরী মৃগ।তা জঙ্গল-পাগল বাবার নেশাটা আমার রক্তেও বর্তেছে।তবে এখন তো আর বন্দুক-টক দিয়ে শিকার।করার জো নেই, তাই আমি ট্রিগারের বদলে শাটার চালাই।

নিশ্চয়ই প্রচুর রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতাও হয়েছে?

সে আর বলতে।একবার তো বাঘের মুখে পড়তে পড়তে বেঁচে গেছি।ওড়িশার সিমলিপালে একরাশ হরিণকে তাক করছি, একটা বাঘ কোত্থেকে গন্ধ শুকে-কে হাজির।জানেন তো, জীবজন্তুর ঘ্রাণশক্তি প্রখর হয়, আর বাঘের তো সাংঘাতিক।নেহাত কভারড জিপে ছিলাম, নইলে সেদিনই আমার ভবলীলা খতম।

মিতিন চোখ কুঁচকে জিজ্ঞেস করল, আপনি কি একাই জঙ্গলে ছবি তুলতে ঢেকেন?

ভাড়াগাড়ি নিলে ড্রাইভার থাকে।তবে কেরলে আমি একাএকাই ঘুরি।

কফি শেষ করে গ্লাস নামালেন কুরুপ। পার্স বের করে দাম মেটালেন।বাইরে এসে মিতিন প্রশ্ন করল, কাল তা হলে আপনার ইডুক্কি যাত্রা?

ভোর পাঁচটায় বেরিয়ে পড়ব। ওখানে এক ধরনের লঙ্গুর আছে, যদি মিলে যায় তো তাদের স্ন্যাপ নেব কয়েকটা।

পাকদণ্ডী অবধি মিতিন-টুপুরকে গাড়িতে এগিয়ে দিলেন কুরুপ।তারপর পেরিয়ারে দেখা হওয়ার কথা স্মরণ করিয়ে বিদায় নিলেন।সাদা মারুতি মিলিয়ে যাওয়ার পর টুপুর বলল, ভদ্রলোক একটু পিকিউলিয়ার টাইপ, তাই না মিতিনমাসি?

কেন?

অনেক কিছু জানেন বটে, তবে ভুলভালও বকেন।

যেমন?

বাঘের ঘ্রাণশক্তি মোটেই প্রখর নয়।বরং বেশ দুর্বলই।অথচ উনি বললেন...

তোড়ের মাথায় মুখ ফসকে বেরিয়ে গেছে হয়তে। কিম্বা ধরেই নিয়েছেন আমরা অজ্ঞ লোক... মিতিন আলগা হাসল, কস্তুরী মৃগ রাজস্থানে নয়, সিকিমে দেখা যায়।অথচ উনি এমন কনফিডেন্টলি বলছিলেন...

কুরুপকে নিয়ে হাসিঠাট্টা করতে করতে রুমে ফিরল মাসিবোনঝি। ঘরে দারুণ উত্তেজনা, এইমাত্র পার্থর ঘোড়া খেয়ে ফেলেছেন অবনী। একটি মাত্র বোড়ে খুইয়ে। নাকের পাটা ফুলছে পার্থর, মুঠো পাকাছে। আর অবনী গুনগুন গান গাইছেন, হরি দিন তো গেল সন্ধ্যা হল পার করো আমারে..

টুপুর বসে পড়ল পার্থমেসোর পাশে। পাউরুটি-টাউরুটিগুলো রেখে মিতিন আবার বেরোচ্ছিল, টুপুর জিজ্ঞেস করল, চললে কোথায়?

ক্লাবের অফিসরুমে।সুনীলকে একটা ফোন করে আসি।

এত রাতে? কেন?

হোটেল থেকে ব্যাগটা আনল কি না জানতে হবে না?

আমি যাব সঙ্গে?

থাক।তুই বসে-বসে গজকচ্ছপের লড়াই দ্যাখ!

মিতিন ফিরল মিনিট পনেরো পর।পিছন-পিছন রাতের খানা হাতে ক্লাবের কর্মচারী।রান্না অতি অখাদ্য, তবে খিদের মুখে পড়তে পেল না, দ্যাখ না দ্যাখ সব কটা প্লেট চেটেপুটে সাফ।

নৈশাহার সাঙ্গ হতেই সকলের মন শুই-শুই করছে। সকাল থেকে ঘোরাঘুরি তো কম হয়নি।ঠান্ডাটাও বাড়ছে ক্রমশ, ঝটপট কম্বলে সেঁধিয়ে গেলে নিদ্রাটাও ভালই জমবে।

.

ভোররাতে বিচিত্র এক স্বপ্ন দেখছিল টুপুর।আরব সাগরের ঢেউ কেটে-কেটে পালতোলা এক বিশাল নৌকো এসে ভিড়ল নারকেল গাছে ছাওয়া ছোট্ট একটা দ্বীপে। নৌকো থেকে নামলেন ইতিহাস বইয়ে দেখা ভাস্কো-দা-গামা।জোস হ্যালেগুয়ার সঙ্গে কথা বলতে বলতে যাচ্ছেন সিনাগগের দিকে।সিনাগগের সামনে থিকথিক করছে পুলিশ, ভাস্কো-দা-গামা থমকে দাঁড়ালেন। কী যেন বলছেন মিস্টার হ্যালেগুয়াকে। কোত্থেকে হঠাৎ পি ভি জর্জ চেঁচিয়ে উঠলেন, মার্ডার মার্ডার!

জর্জের চিৎকারেই টুপুরের ঘুম ছিঁড়ে ফর্দাফাঁই। আচমকা টের পেল কোথায় যেন একটা শব্দ হচ্ছে। কাছেই কোথাও।

অ্যান্টিরুমের দিক থেকে আসছে না আওয়াজটা? একটা সরু আলোও যেন নড়েচড়ে উঠল না?

টুপুর ধড়মড় করে উঠতে যাচ্ছিল, তখনই ফিসফিস মিতিনমাসির গলা, শব্দ করিস না।আমি দেখছি।

পা টিপে-টিপে মিতিন অ্যান্টিরুমে পৌঁছয়নি, অমনি ঝনাৎ করে কী যেন একটা পড়ার আওয়াজ! সঙ্গে ধুপ করে কারও লাফ!

মিতিন চেঁচিয়ে উঠল, যাহ, পালিয়ে গেল!

সহেলিও উঠে পড়েছেন।আলো জ্বলে টুপুরের সঙ্গে তিনিও দৌড়লেন অ্যান্টিরুমে, কী হল রে?

মিতিনের হাতে একটা লম্বা লাঠি।লাঠির ডগায় লোহার আঁকশি বাঁধা।সব মিলিয়ে লগিলগি চেহারা।লাঠিটা ঘুরিয়েফিরিয়ে দেখতে দেখতে মিতিন বলল, এটা দিয়ে কেউ আমাদের জিনিসপত্র টানার চেষ্টা করছিল।ওই দ্যাখো, পার্থর লাল ব্যাগটা জানলা অবধি নিয়ে গেছে।

এ কী সর্বনেশে কাণ্ড! চোর এসেছিল?

তাই তো দেখা যাচ্ছে।পিছনের জানলার হুড়কোটা আগে চাড় দিয়ে খুলেছে, তারপর শিকের ফাঁক দিয়ে লাঠি গলিয়ে দিয়েছিল।

কিন্তু এইটুকু ফাঁক দিয়ে ব্যাগ সুটকেস বের করত কী করে?

শিক ভেঙে ফেলত।সহেলির গলা কাঁপছে, চোরডাকাতের অসাধ্য কিছু আছে!

গরাদ না কেটেও জিনিস হাতানো যায় দিদি।ব্যাগ জানলায় তুলে জামাকাপড় বের করে নেওয়া কী এমন কঠিন?

টুপুর লাঠিটা হাতে নিয়েছে।খানিক নিরীক্ষণ করে বলল, শেপটা খাটের ছত্রীর মতো না?

হুঁ।

ছোট-ছোট করে কোনায় কী যেন লেখাও আছে! এন... না।না, এইচ।তারপর সি।তারপর পি।দ্যাখো তো ঠিক দেখছি?

রাখ তো এখন গবেষণা।সহেলি ঝাপটে উঠলেন, আগে তোর বাবা আর মেসোকে ডাক।এ ঘরে লুঠতরাজ হয়ে যাচ্ছে, আর বাবুরা পড়ে-পড়ে ঘুমোচ্ছেন!

ঠান্ডা-ঠান্ডা ভোরে পার্থ-অবনীকে জাগায় কার সাধ্যি।বাঙালির সুখনিদ্রা বলে কথা।টুপুর-সহেলির গলা প্রায় ফিরে গেল দুই ভায়রাভাইকে তুলতে।শেষ পর্যন্ত অবশ্য চোখ রগড়াতে-রগড়াতে কম্বল ছেড়ে বেরিয়েছে তারা।সহেলির মুখে বৃত্তান্ত শুনে ঘুমের রেশটুকু উধাও।

মিতিন টর্চ হাতে চলে গেছে ঘরের পিছনটায়।জানলার নীচে একটু জঙ্গল-জঙ্গল মতো, তার পরে বেঁটে পাঁচিল।ওপারে এবড়োখেবড়ো ঢাল নেমে গেছে পাকদণ্ডী পর্যন্ত।

সকলেই গিয়ে মুখ বাড়িয়ে-বাড়িয়ে ঢালটা দেখছিল।টুপুর বলল, চোরটা এই রাস্তা দিয়ে চম্পট দিয়েছে।

সে আর বলতে।মিতিন ঝুঁকে মাটি পর্যবেক্ষণ করছিল।টর্চের আলো এপাশ-ওপাশ করতে করতে বলল, পায়ের ছাপ রয়েছে।আই মিন জুতোর।দ্যাখ টুপুর, ছাপটা বেশ স্ট্রেঞ্জ টাইপের!

তাই তো! জুতোর ডগা আছে, গোড়ালি নেই।তবে টোয়ের ছাপ কিন্তু বেশ ডিপ।

সহেলি বললেন, আমার মনে হচ্ছে ওই লোকদুটোরই কাজ।ব্যাটারা বুমবুমের হাতে টাইট খেয়েছিল তো, তাই ঝাল মেটাতে শয়তানি করছিল।

মিতিন বলল, যাহ, ও বেচারারা কেন হতে যাবে?

পার্থ সন্দিগ্ধ স্বরে বলল, হতেও তো পারে।দেখে আসব।একবার?

উত্তরের প্রতীক্ষায় না থেকে পা বাড়াল পার্থ।সঙ্গে টুপুরও।

লোকদুটোর দরজায় টর্চ ফেলে দুজনেই চমকেছে জোর।গুঁফো-টাকমাথা ঘরে নেই! তালা ঝুলছে।

৭-৮

গাড়ি মুন্নার টাউন ছেড়ে বেরিয়ে আসার পর সহেলি দুহাত কপালে ঠেকালেন, হে মা রক্ষাকালী, আর যেন এই জায়গায় না আসতে হয়।

মিতিন হেসে ফেলল, কেন গো? এত সুন্দর জায়গাটা কী দোষ করল?

দুর দুর, যত সব চোর-ডাকাতে ভর্তি!

আহা, একটা ছিঁচকে চোরের জন্য গোটা মুন্নারের বদনাম করে দিচ্ছ?

টুপুর বলল, একটা ব্যাপার খেয়াল করেছ মিতিনমাসি, কেরলে আসার পর থেকে চুরি যেন আমাদের ধাওয়া করে বেড়াচ্ছে। কোচিতে একটা চুরির মধ্যে পড়ে গেলাম, মুন্নারে আমাদের উপরই চুরির অ্যাটেমপ্ট হয়ে গেল...!

সহেলি বললেন, যাত্রাটাই এবার আমাদের শুভ হয়নি। দিনক্ষণ দেখে বেরনো উচিত ছিল। নির্ঘাত মঘা কিম্বা অশ্লেষায় রওনা দিয়েছি, তাই পদে-পদে এত হয়রানি।

অবনী মুখ বেঁকিয়ে বললেন, ওফ, কুসংস্কারের ডিপো!.. শোনো, তোমার গ্রহ-নক্ষত্র মানলে বলতে হয়, যে ট্রেনে আমরা হাওড়া থেকে কোচি পাড়ি দিয়েছিলাম, তার প্রতিটি যাত্রীই এখন ঝঞ্ঝাটে পড়ছে। কারণ সকলেই তো আমরা মোটামুটি একই সময়ে বাড়ি থেকে স্টার্ট করেছিলাম। অশ্লেষা, মঘা নিশ্চয়ই শুধু আমাদেরই টার্গেট করে রাখেনি। ঠিক কি না? তারপর ধরো, আমরা অশুভ লগ্নে বেরিয়েছিলাম বলেই কি সিনাগগে চুরি হল? যদি আমরা বাড়িতে শুয়ে-শুয়ে ঠ্যাং নাচতাম, তা হলে কি হাজার-হাজার মাইল দূরের গ্রেট স্ক্রল রক্ষা পেয়ে যেত? কেউ চাবির ডুপ্লিকেট করাতে পারত না? সিন্দুক খুলতে পারত না?

বক্তৃতা থামাও তো। সহেলি গোমড়া, চুরি হত কি হত না সে পরের কথা। অন্তত আমরা তো জড়াতাম না।

এখনই বা কী জড়িয়েছ? ফেঁসে থাকলে ফেঁসেছে তো সিনাগগের কর্তাব্যক্তিরা। তারা আবার ইহুদি, তোমার অশ্লেষা, মঘা, তারা জানেই না। আর এখানেই বা আমাদের কী ক্ষতিটা হল? একমাত্র ভোর রাতের ঘুমটুকু ছাড়া?

বার বার টেনশনে তো পড়ছি।

একটুআধটু টেনশন থাকা তো ভাল মা। টুপুর মন্তব্য জুড়ল, উত্তেজনা না থাকলে বেড়িয়ে সুখ আছে নাকি? পানসে-পানসে লাগবে না?

পার্থ বলল, আপনার একটা বড় টেনশন কিন্তু কেটে গেছে দিদি। গুঁফো-টাকমাথাকে আমরা মিছিমিছি আসামি বানাচ্ছিলাম।

লোকদুটোকে ঘরে না দেখে কাকভোরে জোর হল্লা জুড়েছিল পার্থ। চেঁচামেচির চোটে মুন্নার ক্লাবের কেয়ারটেকারবাবুটির ঘুম চৌপাট। তিনি তো ঘটনা শুনে হাঁ। ঈশ্বরের নামে শপথ করে বলতে লাগলেন, এমন কাণ্ড মুন্নার ক্লাবের ইতিহাসে নাকি এই প্রথম। এবং মুন্নারের মতো শান্ত উপত্যকায় এভাবে তস্করের আগমন নাকি একান্তই অভাবনীয়। গুঁফো-টাকমাথা সম্পর্কে অভিযোগ তিনি তো হেসেই উড়িয়ে দিলেন। রাত্তিরে নাকি নিজে অনেকক্ষণ গল্প করেছেন লোকদুটোর সঙ্গে। একজনের নাম বাসবন, অন্যজন উন্নিকৃষ্ণন। দুজনেই নাকি যথেষ্ট মালদার, পার্টনারশিপে ব্যবসা করে শুটকি মাছের, কোচির সম্ভ্রান্ত এম জি রোডে তাদের অফিসও আছে। বিশেষ কাজে কোচি থেকে মাদুরাই যাচ্ছে তারা, পথে মুন্নারে খানিক জিরিয়ে নিচ্ছিল। রাত তিনটেয় তারা ফের বেরিয়ে পড়বে একথাও নাকি জানিয়ে দিয়েছিল কেয়ারটেকারকে। এর পর সহেলির আর

কী বলার থাকতে পারে?

পার্থর কথার পিঠে টুপুর বলল, কিন্তু মেসো, চোর যে একটা ধাঁধায় ফেলেছে এতে তো কোনও সন্দেহ নেই।

কীসের ধাঁধা? কোথায় ধাঁধা?

বা রে, স্বচক্ষে তো দেখলে জুতোর ডগা আছে আগা নেই।

এ তো জলবৎ তরলং।ব্যাটা নির্ঘাত পা টিপে টিপে এসেছিল।যাতে কেউ টের না পায়।

পা টিপে আসার জায়গা কোথায়? পাঁচিল টপকালেই তো জানলা।মাঝে বড়জোর হাত তিনেক স্পেস।

তা হলে...।পার্থ মাথা চুলকোল, ব্যাটা বোধ হয় গোটা জুতোর ছাপ রাখতে চায়নি।পাছে জুতো থেকে ধরা পড়ে যায়।এ থিয়োরিটা নিশ্চয়ই ভুল নয় ম্যাডাম শার্লক হোমস?

কোথায় শার্লক হোমস, কোথায় আমি! ওই তুচ্ছ ছাপ দেখে শার্লক হোমস কত কী বলে দিতে পারতেন জানো? লোকটা রোগা না মোটা, ফরসা না কালো, মাথায় টুপি ছিল কি ছিল না, দক্ষিণ আফ্রিকার লোক নাকি কানাডার, বাঁ হাতে দেশলাই জ্বালায় না ডান হাতে, সিগারেট খায় না চুরুট...।বলতে বলতে মিতিন ফিক-ফিক হাসছে, আমার অত বিশ্লেষণ করার ক্ষমতাই নেই।তবে হ্যাঁ, এটুকু বলতে পারি, লোকটার হাইট সাড়ে পাঁচ ফিটের বেশি নয়।শরীরে কষ আছে, কিন্তু চেহারাটি ছিপছিপে।

অবনীর চোখ গোল গোল, কী করে বুঝলে?

ভেরি সিম্পল লজিক।জানলাটা আমার মাথায়-মাথায়।অর্থাৎ মাটি থেকে পাঁচ ফুট তিন ইঞ্চি।সুতরাং ঘরের ভিতরটা দেখতে গেলে চোরের চোখ পাঁচ ফুট তিন ইঞ্চির উপরে থাকতে হয়।তা নয় বলেই লোকটাকে বুড়ো আঙুলের ডগায় ভর দিয়ে, উঁচু হয়ে ঘরটাকে দেখতে হয়েছিল।চোখ থেকে মাথার মাপ মিনিমাম তিন ইঞ্চি।সওয়া পাঁচ ফুটের সঙ্গে এবার তিন ইঞ্চি।যোগ করে নিন।কত হল? আর যে লোক ওই সরু আঁকশি দিয়ে ব্যাগ-সুটকেস তোলার চেষ্টা করে, শরীরে তার তো কষ থাকতেই হবে।আর ছিপছিপে না হলে ওই এবড়োখেবড়ো ঢালু পথ বেয়ে তাড়াতাড়ি সে পালায় কী করে? প্লাস, চার ফুট উঁচু পাঁচিলও তাকে টপকাতে হয়েছে।

অবনী চমৎকৃত।গদগদ গলায় বললেন, আমরা কেন এভাবে ভাবি না?

টুপুর গর্বিত স্বরে বলল, এই জন্যই তো মিতিনমাসি ইজ গ্রেট।

মিতিন হেসে বলল, গ্রেট-ফেট কিছুই নই।শুধু চোখ-কানটা খোলা রাখি।মনের দরজাটাও।ভাবনাচিন্তা তৈরি হওয়াটাও একটা প্রসেস অবনীদা।এর জন্য প্রয়োজন চর্চা, অধ্যবসায়, আর নিষ্ঠা।আর-একটু কমনসেন্স।

গুণগুলো যে মিতিনমাসির পুরো মাত্রায় আছে সে তো টুপুর জানেই।অধ্যবসায় না থাকলে মাত্র কয়েক বছরে মিতিনমাসি গোয়েন্দা হিসেবে এতটা নাম করতে পারত। এখন তো পুলিশের উপরমহলের লোকরাও মাঝেমধ্যে মিতিনমাসির পরামর্শ নিতে আসে। অপরাধতত্ত্বের সমস্ত বিভাগ নিয়ে দিন-রাত চর্চা করে মিতিনমাসি। ফরেনসিক সায়েন্স, অপরাধীদের মনঃস্তত্ত্ব, নানারকম অস্ত্রশস্ত্রের খুঁটিনাটি, অ্যানাটমি, ফিজিওলজি, এই আইন সেই আইন, কী না পড়ে।পুরনো জটিল সেগুলোকেও স্টাডি করে পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে। আর নিষ্ঠায় তো মিতিনমাসি লা-জবাব।গত এপ্রিলে শ্যামপুকুরে মিত্তিরবাড়ির অষ্টধাতুর বিগ্রহ চুরি হওয়ার কেস নিয়ে যেভাবে খাটল, সে তো দেখার মতো।শেষমেশ প্রমাণ করে ছাড়ল তো পরিবারের প্রবীণা গৃহিণীই আসল খলনায়িকা।মিত্তিরবাড়ির কর্তাব্যক্তিরা তো হাল ছেড়েই দিয়েছিল, পুলিশও বাড়ির চাকরকে হাজতে পুরে নিশ্চিন্তা একমাত্র মিতিনমাসি আদাজল খেয়ে লেগে না থাকলে থোড়াই জানা যেত প্রকৃত সত্য।মাত্র

দশ হাজার টাকার জন্য টানা তিন মাস পরিশ্রম, ভাবা যায়? সাধে কি টুপুর মিনিমসির সঙ্গে সেঁটে থাকে।

টুপুর জানলার বাইরে চোখ রাখল।চা-বাগানের ঢল পেরিয়ে গাড়ি আরও উঁচুতে উঠছে এখন।একটার-পর-একটা পাহাড় টপকাচ্ছে।নীচে তাকালে দেখা যায় ফেলে আসা পথটাকে।অজগরের মতো।পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে বেড় দিয়েছে পাহাড়কে।হলুদ রোদ্দুর মেখে পড়ে আছে নিঝুম।

সামনের সিটে পার্থ এতক্ষণ কেরলের একটা ম্যাপ খুলে বসেছিল।পরশু কিনেছে কোচি থেকে।টুরিস্ট গাইড হিসেবে মানচিত্রখানা ভারী কাজের।রাস্তাঘাট, পাহাড় পর্বত, নদী-লেকজঙ্গল, সব কিছুরই হদিস মিলে যায়। ম্যাপটা দেখতে দেখতে পার্থ হঠাৎ বলে উঠল, তা তোমার কমনসেন্স এবার কি কিছু বলছে।ম্যাডাম?

কী ব্যাপারে? মিতিন চোখ ঘোরাল।

রিগার্ডিং এসব চোরফোর? এমন উপদ্রব কি মাঝে-মাঝেই হবে?

হওয়ার কোনও কারণ তো দেখি না। তবে কিনা...।মিতিন একটু থমকাল, দিদিকে যাই বলি না কেন, ছিঁচকে চোরটা কিন্তু ভাবাচ্ছেই।

কিঁউ?

কারণ আমাদের উপর দিয়ে মুন্নার ক্লাবে চুরির উদ্বোধন হচ্ছে, এটা ঠিক আমার হজম হচ্ছে না।

কেয়ারটেকার ঢপ মেরেছে বলে মনে হয়?

কী জানি।তবে আমাদের উলটো দিকের রুমে কিন্তু চোরের পক্ষে হানা দেওয়া ঢের সহজ ছিল।মনে করে দ্যাখো, ওই ঘরের জানলা রাতে খোলাই ছিল।কষ্ট করে হুড়কো ভেঙে কেন যে লোকটা আমাদের উপর কৃপাদৃষ্টি দিল?

ওঘরে ছিল তো বাবা, মা আর মেয়ে।ওদের দেখে চোরের হয়তো মনে হয়েছে তেমন জিনিসপত্র নেই!

অর্থাৎ চোর আগে থেকেই দেখে নিয়েছিল কোন ঘরে বেশি জিনিস আছে?

হতেই পারে।মুন্নার ক্লাবের কর্মচারীরা তো সব ঘরেই যাতায়াত করছিল।ইনফ্যাক্ট, জিনিসপত্র তো তারাই ঘরে ঢুকিয়েছে।আর কর্মচারীদের কারও সঙ্গে চোরের যোগসাজশ থাকতেই পারে।

হুঁ।হতে পারে অনেক কিছুই।কেয়ারটেকারকেও আমি সত্যবাদী যুধিষ্ঠির বলে ধরে নিচ্ছি না।... তবে আমার সিক্সথ সেন্স বলছে সামথিং ইজ রং সামহোয়্যার।

কী রকম?

তা আমি কী করে বলব? আগেই তো বলেছি আমি শার্লক হোমস নই। আমার শুধু এটুকুই মনে হচ্ছে বেড়ানোর কটা দিন আমাদের বোধ হয় আরও সতর্ক থাকা উচিত।

কেন রে মিতিন? সহেলি বিপন্ন সুরে বললেন, চোর কি আমাদেরই পিছনে লেগেছে? কী হবে তা হলে?

ওফ, দিদি।দুশ্চিন্তা ঝেড়ে ফ্যালো তো! টুরটা এনজয় করে।বলেই সহেলির মুখটা বাইরে ঘুরিয়ে দিয়েছে মিতিন, ওই দ্যাখো আনাইমুড়ি পাহাড়।

একটা উঁচু পাহাড় দেখা দিয়েছে বটে।আকারে মোটেই সুদৃশ্য নয়, বরং বেঢপই বলা যায়।কেমন যেন ন্যাড়া ন্যাড়া লাগে, খাবলাখাবলা দাড়ির মতো গাছপালা লেগে আছে গায়ে।

ওই পাহাড়েই উঠতে-উঠতে এক জায়গায় থামতে হল টুপুরদের।এবার এরাভিকুলম ন্যাশনাল পার্কে ঢুকবে গাড়ি, তার আগে টোল ট্যাক্স দিতে হবে।দুধারে বড় বড় হোর্ডিংয়ে লেখা আছে জন্তুজানোয়ারদের নাম।ছবি সহ।লেখা আছে অরণ্যের আচরণবিধি।

দেখেই ঝিমন্ত বুমবুম আচমকা গা ঝাড়া দিয়ে উঠেছে।জ্বলজ্বলে চোখে বলল, ওমা, এখানেও হাতি আছে? সারাণ্ডার মতো?

অবাক হওয়ার কিছু নেই বুমবুম। পার্থ বলল, কেরলে অজস্র হাতি। পেরিয়ার জঙ্গলে গিয়ে দেখবি হাতি থিকথিক করছে।জলে লুটোপুটি খাচ্ছে।

টুপুর বলল, আরও কত কী আছে গো মেসো! শম্বর, গাউর, লংগুর... বাঘ, চিতাবাঘও!

দ্যাখ, কপালে থাকলে দর্শন মিলে যাবে।সারাণ্ডায় তো প্রায় কিছুই জোটেনি।হরিণ আর খরগোশ ছাড়া।

টিকিট কেটে আশায়-আশায় টুপুররা ঢুকল বটে, তবে ন্যাশনাল পার্কের ভিতরে পৌঁছে হতাশও হতে হল যথেষ্ট।রাজামাল্লি বলে একটা জায়গায় গাড়ি থেকে নেমে পড়তে হয়েছে, হাঁটতে-হাঁটতে পাহাড় বেয়ে উঠে গেছে অনেকটাই কিন্তু কোথায় কী! জঙ্গলই তো নেই! পাহাড়ের গায়ে ঘাস আছে, কোথাও কোথাও ঝোপঝাড়ও, তবে তাদের অরণ্য বলে কল্পনা করাকঠিন।হাতি, বাঘ দূরস্থান, পাল পাল ছাগল ছাড়া আর কিছুই তো নজরে এল না! পার্থমেসো অবশ্য বলল, এ নাকি অতি বিরল প্রজাতির ছাগল, এদের নাম নীলগিরি টার।এদের ক্ষুরগুলো নাকি ভারী অদ্ভুত, অবলীলায় পাহাড় বেয়ে তরতরিয়ে উঠতে পারে এরা।তা শুধু ছাগল দেখে কি আর মন ভরে?

গাড়িতে ফিরে সহেলি বিরক্ত মুখে বললেন, দুর দুর, মিছিমিছি সময় নষ্ট।

পার্থ বলল, যা বলেছেন।মাঝখান থেকে চড়াই-উতরাই করে খিদে পেয়ে গেল।লাল ব্যাগে কিছু আছে কি?

স্রেফ পাউরুটি আর চানাচুর।

তাই দিন।মুখটা তো চলুক।

ম্যাথু স্টিয়ারিং-এ বসেছে।জিজ্ঞেস করল, নাউ হোয়্যার? মাটুপেট্টি?

আর সেখানে গিয়ে কী হবে? পার্থ ঠোঁট ওলটাল, লেক ভেবে যাব, গিয়ে দেখব বড়সড় চৌবাচ্চা।

সহেলি বললেন, তা হলে বাদ দাও না।সোজা পেরিয়ার চলো।

না না, মাটুপেট্টি যেতেই হবে। অবনী বাধ সাধলেন, সুনীল আমায় বারবার করে মাটুপেট্টির কথা বলেছে। ড্যাম থেকে জঙ্গল দেখা নাকি ইউনিক এক্সপিরিয়েন্স।

অগত্যা গাড়ি ফিরল আবার মুন্নার অভিমুখে। টাউন ছুঁয়ে বয়ে ঘুরল, মিনিট চল্লিশের মধ্যেই এসে গেল মাটুপেট্টি।

নাহ্, পান্নিভাসাল নদীর উপর ড্যামটা সত্যিই বিশাল।বাঁধ পেরিয়ে গাছে গাছে ছাওয়া পথ পাক খেয়ে চলে গেছে জলাধারের কিনারে। উহুঁ, শুধু জলাশয় না বলে বড়সড় লেক বলাই শ্রেয়। ওপারে পাহাড় বেয়ে উঠে গেছে জঙ্গল, প্রায় একদম পাড় থেকেই।কী অপূর্ব যে লাগছে দূর থেকে।

বেলা বেড়েছে।লোকজন তেমন একটা নেই আশপাশে।রোদ বাঁচিয়ে এক ঝাঁকড়া গাছের ছায়ায় বসল সবাই। মোহিত হয়ে দেখছে জল, দেখছে জঙ্গল। লেকে স্পিডবোট চলছে। কয়েকটা, প্রকৃতির নির্জনতাকে ভেঙে

বিকট শব্দ তুলে শা-শা ছুটে বেড়াচ্ছে এদিক-ওদিক।বোটের ধাক্কায় উত্তাল ঢেউ উঠছে স্থির জলে।

গোটা তিনেক নৌকো ঘাটে দোল খাচ্ছিল।সেখান থেকে একটা লোক চেঁচিয়ে ডাকল, ওয়ান্ট এ জয়রাইড স্যার?

পার্থ জিজ্ঞেস করল, কী রে, চড়বি নাকি স্পিডবোটে?

লাজুকলাজুক মুখে টুপুর বলল, গেলে হয়।

সহেলি হাঁ-হাঁ করে উঠলেন, কক্ষনও না।অত জোরে চলছে, একবার যদি গোঁত খেয়ে উলটে যায়!।

ভয় পাচ্ছেন কেন দিদি? কিছু হবে না, চলুন।

না বাপু, আমি ওতে নেই।

অবনী বললেন, আমারও অত গতি সহ্য হয় না।মাথা ঘোরে।

টুপুর বলল, তা হলে তোমরা এখানে বোসো, আমরা ঘুরে আসি।যাব?

বারণ করলে কী তোমরা শুনবে? সহেলির স্বরে অসন্তোষ, যাও, তবে বেশি নড়াচড়া কোরো না, মেসোর হাত ধরে বোসো।...মিতিন, তুইও বুমবুমকে ভাল করে সামলে রাখবি।

আধ ঘণ্টা ঘোরাবে বোট। মাথাপিছু পঞ্চাশ টাকা। পার্থ খানিক দরদস্তুরের চেষ্টা করল, জপাতে পারল না লোকটাকে।বুমবুমেরও পুরো ভাড়াই লাগবে।

ক্যামেরা লাল ব্যাগে পুরে নিল পার্থ।যাতে জল ছিটকে এসে লেন্সে না লাগে।ব্যাগ কাঁধে ঝুলিয়ে বুমবুমকে নিয়ে লাফ দিয়ে উঠে পড়ল স্পিডবোটে। মিতিন আর টুপুরও কোমর বেঁধে চড়ে পড়েছে। সামনে পিছনে মিলিয়ে জনাপাঁচেকই বসতে পারে বোটে।মিতিন আর টুপুর পিছনের আসন দখল করল, পার্থ আর বুমবুম সামনে।নৌকোর লেজে বসেছে চালক, সেখান থেকেই নিয়ন্ত্রণ করবে ইঞ্জিন।আর নৌকোর অভিমুখ।পার্থর সামনে একটা স্টিয়ারিং আছে বটে, তবে সেটি নেহাতই শো-পিস।

গোঁ-গোঁ শব্দ বাজিয়ে ছুটতে শুরু করল স্পিডবোট। পলক ফেলতে না ফেলতে পাড় সরে গেছে দূরে।টুপুর আর বুমবুম হাত নাড়ল অবনী-সহেলিকে, তারা দেখতে পেলেন না।

লেকের মধ্যিখানে এসে ইঞ্জিন বন্ধ করে দিল চালক।অল্প-অল্প দুলছে নৌকো।খুশি-খুশি মেজাজে চতুর্দিক দেখছিল টুপুর। জলাশয়টা বেশ খানিকটা গিয়ে ডাইনে ঘুরেছে, সেখানে আরএকটা ঘাট থেকে ছাড়ছে স্পিডবোট।তার ওপাশে সুইস গেট, জল বেঁধে রাখার জন্যে।

বুমবুম হঠাৎ উল্লাসে চিৎকার করে উঠল, দিদিভাই, ওই দ্যাখ হাতি...হাতি!

কই? কোথায়?

ওই তো।তর্জনী তুলে ওপারের জঙ্গলটা দেখাল বুমবুম, ওই তো, গাছের পাশে দাঁড়িয়ে! একটা.. দুটো... না না, তিনটে!

টুপুর তবু দেখতে পাচ্ছে না।চোখ সরু করে খুঁজছে জঙ্গলময়।সহসা মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল।পেয়েছে দেখতে পেয়েছে।

মিতিন আঙুল নেড়ে বলল, ভাল করে দ্যাখ। মনে হচ্ছে না হাতি তিনটের মাথার ওপর আরও একজোড়া

হাতি?

তাই তো।ঠিকই তো।দুটো হাতি পাহাড়ের একটু উপরে, বাকি তিনটে নীচে।দূর থেকে মনে হয় সত্যিই হাতির মাথায় হাতি!

বুমবুম বলল, তিগুলো পাহাড়ের গায়ে দাঁড়িয়ে আছে কী করে বাবা? গড়িয়ে পড়ে যাচ্ছে না কেন?

পার্থ বলল, বুঝতে পারছিস না? পাহাড় হাতিদের টানছে, হাতিরা পাহাড়কে।একে বলে মাধ্যাকর্ষণ।

কী কর্ষণ?

মিতিন হালকা ধমক দিল পার্থকে, আই, ভুলভাল শেখাচ্ছ।কেন? না রে বুমবুম, একটা হাতিও পাহাড়ের ঢালে দাঁড়িয়ে নেই।ওরা যেখানটায় আছে সে জায়গাটা মোটামুটি প্লেনই।দূর থেকে দেখছি বলে ওরকম লাগছে।

পার্থ ইঞ্জিনচালককে বলল, এই ভাই, আর-একটু কাছে যাওয়া যায় না?

যাবেন? চলুন।

আবার ইঞ্জিনের গোঁ-গোঁ।ভীম বেগে জল চিরে ছুটল স্পিডবোট।জঙ্গলের ধার ঘেঁষে গর্জন করতে করতে ঘোরাচ্ছে টুপুরদের। পার্থ ক্যামেরা বের করে ফেলল। টেলিলেন্স লাগিয়ে ফোকাস করে ফেলেছে হাতিগুলোকে।বুমবুম আনন্দে হাততালি দিয়ে উঠল।টুপুর আর মিতিনও হাতিতে বিভোর।

ঠিক তখনই ঘটনাটা ঘটল।

তীব্র গতিতে হঠাৎই ধেয়ে এল আরএকটা স্পিডবোট।একেবারে কাছে এসে, টুপুরদের স্পিডবোটকে ধাঁই করে ধাক্কা মেরেই পার্থর কাঁধে হ্যাঁচকা টান।পার্থ টাল সামলাতে না পেরে পড়ে যাচ্ছিল, মিতিন টেনে ধরে নিয়েছে তাকে।কিন্তু ততক্ষণে পার্থর কাঁধের ব্যাগটা ছিনিয়ে নিয়ে অনেক দূরে চলে গেছে আক্রমণকারী।

ঘটনার আকস্মিকতায় চালক হতভম্ব থামিয়ে দিয়েছে ইঞ্জিন।নার্ভাস গলায় জিজ্ঞেস করল, ইউ ওকে স্যার?

পার্থ দম নিতে নিতে বলল, হুঁ।

ক্যামেরা সেভড।গুড লাক।

নিকুচি করেছে গুড লাকের।মিতিন চেঁচিয়ে উঠল, ফলো করুন লোকটাকে।এক্ষুনি।

মাঝে বড়জোর সময় গেছে পনেরো সেকেন্ড, তার মধ্যেই হানাদার স্পিডবোট আরও দূরে।টুপুররা যখন মাঝ দরিয়ায়, সে তখন পৌঁছে গেছে অন্য ঘাটটায়।নিমেষে লোকটা লাফ দিল বোট থেকে, নিমেষে উবে গেল কর্পূরের মতো।টুপুরদের নৌকো যখন ঘাটে গিয়ে ভিড়ল, তখনও পাড়ের কেউ জানেই না জলে কী ঘটে গেছে এইমাত্র।

নেমেই জব্বর একটা হইচই বাধিয়ে দিল টুপুরদের চালক। হাউমাউ করে ছিনতাই বৃত্তান্ত শোনাচ্ছে মলয়ালমে।মিতিন অবশ্য নেমেই রাস্তা ধরে দৌড়েছিল, খানিকটা গিয়ে ফিরে এসেছে।হাঁপাতে-হাঁপাতে বলল, নাহ্, পাখি উড়ে গেল।

টুপুর বলল, এত তাড়াতাড়ি?

গাড়ি দাঁড় করানো ছিল।অ্যাম্বাসাডার।

নাম্বার নোট করেছ?

পারলাম না।হুশ করে বেরিয়ে গেল।একঝলক চোখে পড়ল নাম্বারপ্লেটটা।ভাড়ার গাড়ি।

হলুদের ওপর কালোয় লেখা?

হাঁ।

ভ্যাবাচাকা খাওয়া পার্থ আর বুমথুমকে ঘিরে ছোট্ট একটা জটলা।আছে মোটরবোটের চালকরা, দু-চারজন যাত্রীও।লোকটা যার মোটরবোট নিয়ে গিয়েছিল, সেও রয়েছে ভিড়ের মধ্যে।

মিতিন তাকে জিজ্ঞেস করল, আপনি লোকটাকে একা ছেড়ে দিয়েছিলেন?

অল্পবয়সি চালক হাত কচলাচ্ছে, চাইল যে।অনেকে এরকম নেয় ম্যাডাম।একা বোট চালিয়ে মজা পায়।

কখন নিয়েছিল ভাড়া?

দশ মিনিটও হয়নি।

এই ঘাটে এসেছিল কখন?

এসেই তো বোট নিল।

একাই ছিল? নাকি সঙ্গে কেউ...?

আর কাউকে তো দেখিনি ম্যাডাম।

চকিতে ঘটনাটা ঘটে যাওয়ায় টুপুর ভালভাবে লক্ষ করতে পারেনি লোকটাকে।তাড়াতাড়ি মিতিনকে বলল, লোকটার চেহারার ডিটেল ডেসক্রিপশন নিয়ে নাও।

প্রয়োজন নেই।মিতিনের মুখ থমথমে, ওই বসন্তের দাগওয়ালা মুখ আমি জীবনে ভুলব না।

.

০৮.

দুপুরের পর থেকে মেঘ জমছিল আকাশে।ছটা বাজতে না বাজতে নিভে গেল দিনের আলো।প্রায় সঙ্গে সঙ্গে আছড়ে পড়ল বৃষ্টি।দমাদম ড্রাম পেটাচ্ছে গাড়ির চালায়।

ম্যাথু গতি আরও কমিয়ে দিল।এমনিতেই পার্বত্য পথে যথেষ্ট ধীরে চালাচ্ছিল, বর্ষণ শুরু হতে কোয়ালিস এখন কচ্ছপ।প্রতিটি বাঁক অতি সন্তর্পণে ঘুরছে ম্যাথু, পাছে গাড়ির চাকা পিছলে যায়।

মাট্টুপেট্টির ঘটনায় তার যাত্রীরা থম মেরে গেছে, নতুন আতান্তর ডেকে এনে সে আর তাদের উত্ত্যক্ত করতে চায় না।

সব কটা জানলার কাচ বন্ধ।সাত-সাতটা মানুষের নিশ্বাসে গরম হয়ে উঠছে ভিতরের বাতাস।কথাও বিশেষ বলছে না কেউ।সহেলি তো আগাগোড়াই গুম।অন্ধকার পাহাড়ি জংলা-জংলা।রাস্তায় আকাশ ভেঙে পড়ার পর তিনি যেন আরও গুটিয়ে গেছেন।মাঝে-মাঝে মেঘ ডাকছে গুড়গুড়, চিকন বিদ্যুতে ফালা-ফালা হচ্ছে। চরাচর, কেঁপে-কেঁপে উঠছেন সহেলি।ইষ্ট নাম জপ করাও ভুলে গেছেন বোধ হয়।

ভিতরের গুমোট ভাবটা কাটাতেই যেন অবনী হঠাৎ বলে উঠলেন, সাউথে বেড়ানোর এই এক ঝামেলা।দুটো করে মনসুন।জুন-জুলাইতেও ভোগান্তি, অক্টোবর-নভেম্বরেও।

সহেলি ক্ষীণ স্বরে বললেন, বৃষ্টিকে দুষে কী হবে? আমরা তো এমনিই ভুগছি।এখন ভালয়-ভালয় বাড়ি ফিরতে পারলে হয়।

টুপুরের মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, বাড়ির তো এখন ঢের দেরি মা।পেরিয়ার আলেপ্পি কোভালাম-টোভালাম সেরে কোচি, তারপর তো কলকাতা।

খুব হয়েছে, আর কোথাও নয়।পেরিয়ারই শেষ, পেরিয়ার থেকেই ফেরা।...পার্থ, পেরিয়ার থেকে সোজা ট্রেন ধরা যায় না?

ম্যাপ ঘেঁটে-ঘেঁটে কেরল সম্পর্কে এখন অনেকটা সড়গড় হয়েছে পার্থ।ব্যাগ হারিয়ে মনমরা থাকলেও সে হেসেই উত্তর দিল, না দিদি।ট্রেন ধরতে হলে সেই কোট্টায়াম, নয় মাদুরাই, নয় কোচি।সবই হরেদরে সওয়াশো থেকে দেড়শো কিলোমিটারের ধাক্কা।

ও।সহেলি ফের মিইয়ে গেলেন, তা তোমাদের পেরিয়ার আর কদ্দূর?

ম্যাথুর ইংরেজিতে ম্যাথুকে প্রশ্ন করল পার্থ, পেরিয়ার হাউ ফার ম্যাথু?

উইন্ডস্ক্রিনে ওয়াইপার চলছে, তবু জলীয় বাষ্পে কাচ ঝাপসা।বাঁ হাতে কাচ মুছতে-মুছতে ম্যাথু জবাব দিল, কুমিলি নিয়ার।ওনলি সেভেন কিলোমিটার।থেক্কাডি থারটিন।

থেক্কাডি আর পেরিয়ার তো সেম, তাই না?

ইয়েস স্যার।গাঁও কা নাম থেক্কাডি, ফরেস্ট পেরিয়ার।হিন্দি ইংরেজির জগাখিচুড়ি বানিয়ে ফেলল ম্যাথু, কুমিলি গুড় স্যার।হোটেল হ্যায়।

পার্থ ঘাড় ঘোরাল, কী গো, দুটো জায়গাই তো কাছাকাছি।কোথায় থাকবে?

মিতিন অন্যমনস্ক ছিল।বলল, উ?

বলছি পেরিয়ার অবধি এগোবে? না কুমিলিতেই বডি ফেলব?

আগেই থামো।দিদি কাহিল হয়ে পড়েছে।সাড়ে তিন ঘণ্টা গাড়িতে ঠায় বসে থাকা বলে কথা?

মাটুপেট্টি ড্যাম থেকে কাছাকাছি থানায় নিয়ে যাওয়া হয়েছিল গাড়ি।দেবীকুলমে।ছিনতাইয়ের রিপোর্ট লেখানোর পর দেবীকুলমেই কোনওরকমে সারা হয়েছিল মধ্যাহ্নভোজ।তারপর থেকে গাড়ি চলছে তো চলছেই।জলদি-জলদি পেরিয়ার পৌঁছতে হবে বলে চায়ের জন্যও দাঁড়ানো হয়নি কোথাও।টুপুরের তো বসে বসে পায়ে ঝিঁঝিঁ ধরে যাচ্ছিল।কতবার যে কানে চিমটি কেটে ছাড়াল অসাড় ভাবটাকে।

বৃষ্টির তেজ কমছে।জানলার কাচ সামান্য ফাঁক করল টুপুর।হাওয়া আসুক।তা শুধু হাওয়া নয়, সঙ্গে একটা আধচেনা মিষ্টি গন্ধও যেন ঝাপটা মারল নাকে।

জোরে নাক টেনে টুপুর বলল, কীসের গন্ধ আসছে বলো তো মিতিনমাসি?

এলাচ।সম্ভবত এলাচ বনের পাশ দিয়ে যাচ্ছি।

দুধারে তো কফিগাছের জঙ্গল ছিল, এলাচ বাগান এসে গেল?

এই রিজিয়নটাই তো এলাচ, লবঙ্গ, দারচিনির আর গোলমরিচের।শুনেছি থেক্কাডি থেকে কোট্টায়াম যেতে একটা পাহাড় পড়ে, পাহাড়টার নামই কার্ডামম হিল।এলাচ পাহাড়।সাধে কি কেরলে এসে ঘাঁটি গেড়েছিল ইউরোপিয়ানরা!

কথার মাঝেই গাড়ি চলে এসেছে সমতলে।গতিও বেড়েছে খানিক।শুরু হয়েছে জনপদ।দুদিকে দেখা যায় দোকানপাট, ঘরবাড়ি, মানুষজন।বৃষ্টিও এখন টিপটিপ-টিপটিপ।

ম্যাথু ঘাড় দুলিয়ে বলল, দিস ইজ কুমিলি স্যার।

পার্থ বলল, আমরা এখানেই থাকব।একটা ভাল দেখে হোটেলে নিয়ে চলো।

ও কে স্যার।

এক তেমাথার মোড়ে এসে ডাইনে গাড়ি ঘোরাল ম্যাথু।বাজারমতো জায়গা।একটা চার্চও আছে।দুচারটে হোটেলও।সেখান থেকে আর-একটু এগিয়ে থেমেছে।

বাঁয়ে এক ঝকঝকে হোটেল।মাইকেলস ইন।ম্যাথু বলল, সেফ প্লেস স্যার অ্যান্ড দিস রোড অলসো গোজ টু পেরিয়ার।

নামে সরাইখানা হলেও হোটেলটা বেশ জবরদস্ত।চমৎকার বন্দোবস্ত, নিজস্ব রেস্তোরাঁ আছে।দক্ষিণী খানার পাশাপাশি চাইনিজ, মোগলাইও মেলে।

ব্যস, পার্থর মনমেজাজ খোলতাই হয়ে গেল।

পাওয়া গেছে মুখোমুখি দুখানা ঘর।দোতলায়।বৃত্তাকার প্যাসেজে ঘরগুলো এমনভাবে সাজানো যে মুখোমুখি না বলে একটু কোনাকুনিও বলা যায়।আবার পাশের পাশেরটাও বলা চলে।

জিনিসপত্র এবার আর এক জায়গায় নয়, রাখা হল ভাগাভাগি করে।ব্যাগ, সুটকেস বয়ে আনা বেয়ারাটিকে খর চোখে জরিপ করে নিলেন সহেলি।লোকটা যেতেই তাড়াতাড়ি লটবহর ঢোকানোর চেষ্টা করলেন খাটের তলায়।কিছুই সেখানে গলল না।বিফল মনোরথ হয়ে মিতিনকে বললেন, আমার তো মনে হয় সিংগল খাটদুটোকে আলাদা-আলাদা করে ফেলা উচিত।পার্থদেরও বলে আয় সুটকেস-টুটকেস যেন দুটো খাটের মধ্যিখানে রাখে।

মিতিন বিছানায় আধশোওয়া হয়েছে।বলল, কেন এত মাথা খারাপ করছ দিদি? দোতলার জানলা দিয়ে লগি গলানো কি সোজা কাজ?

অসাধ্য তো নয়।কার্নিসে তো ওঠাই যায়।

চিন্তা কোরো না।আমি সারারাত জেগে থাকব।

দ্যাখো, যা ভাল বোঝ।দাসীর কথা বাসি হলে মিঠে হয়।তখন অত করে বললাম ওই অক্ষুণে স্পিডবোটে উঠো না, বিপদ ঘটার পর শিক্ষা হল তো?

আগেই বুঝি টের পেয়েছিলে কেউ একজন ঝাঁপিয়ে পড়বে?

কিছু একটা অমঙ্গল হবে, মনে তো হচ্ছিল।ডান চোখ খুব নাচছিল তখন।

চেয়ারে হেলান দিয়ে মা-মাসির চাপান উতোর শুনছিল টুপুর।এবার হেসেই ফেলল।

দেখেই সহেলির চোখ কটমট, তুমি বসে বসে লেজ নাড়াচ্ছ কেন? রাস্তার জামাকাপড়টা ছাড়ো না।আজ তো স্নানও হল না, ঘাড়ে-মুখে ভাল করে জল দাও।

তাড়া খেয়ে একসেট সালোয়ার-কামিজ বের করে লাগোয়া বাথরুমে ঢুকল টুপুর। মুন্নারের মতো না হলেও এখানে একটু শীতশীত ভাব আছে। সম্ভবত বৃষ্টি হল বলেই। বেসিনের জল ঠান্ডা কনকনে। তবে জলের ছোঁয়ায় আরামই লাগল। পোশাক বদলে বেরিয়ে এসে দেখল মিতিনমাসি নেই, ঘরে এখন বুমবুম আর পার্থমেসো।বুমবুম টিভির সামনে।উদ্দাম কার্টুন চ্যানেল চলছে।

পার্থর হাতে হোটলের মেনুকার্ড।পড়তে পড়তে জিজ্ঞেস করল, কী রে টুপুর, কিছু খাবি তো এখন? স্ন্যাক্স-ট্যাক্স?

খিদে খানিকটা পেয়েছে বটে।টুপুর মাথা চুলকোল, পকোড়া পাওয়া যাবে?

সিওর।চিকেন প্রন চিজ ভেজিটেবল. কোনটা নেব?

প্রনই বলো।

অবনী চেয়ারে চোখ বুজে বসেছেন।বলে উঠলেন, আমার জন্য ভাজাভুজি নয়।স্যান্ডুইচ।

সঙ্গে গরমাগরম কফি? চলেগা?

চলেগা কী গো? টুপুর বলল, দৌড়েগা।

ফোন তুলে রুম সার্ভিসকে অর্ডার দিল পার্থ।বুমবুমের জন্য দুধ বলার সঙ্গে সঙ্গে আপত্তি জুড়েছে বুমবুম। দুধ নয়, তার আইসক্রিম চাই।

পার্থমেসোর ম্রিয়মাণ ভাব কেটেছে দেখে ভাল লাগছিল টুপুরের। একটা ছিনতাইয়ের জন্য বেড়ানোর আনন্দটাই মাটি হয়ে যাবে এ তার মোটেই পছন্দ হচ্ছিল না। তবে হ্যাঁ, ব্যাপারটা যে রোমহর্ষক তাতে কোনও সন্দেহ নেই।কিন্তু শুধু ক্যামেরার জন্য অত বড় ঝুঁকি নিল লোকটা? বিশ্বাস হয় না।গাড়ি ভাড়া করে এসে, স্পিডবোটের চালককে কড়কড়ে পাঁচশো টাকা খুঁজে দিয়ে, শেষ পর্যন্ত স্রেফ একটা ব্যাগ হাতিয়ে নিয়ে গেল? কী আজব কাণ্ড! নাকি অন্য কোনও স্পিডবোট নিশানা ছিল লোকটার? ভুল করে অ্যাটাক? ওই সময়ে গোটা পাঁচ-সাত বোট ছোটাছুটি করছিল জলে, হয়তো লোকটা গুলিয়ে ফেলেছে? কথাটা একবার তুলবে নাকি এখন? থাক গে, যা হওয়ার তো হয়েই গেছে, পুরনো কাসুন্দি ঘেঁটে আর কী লাভ?

খাবার এসে গেল।পিছন-পিছন মিতিনমাসিও।টুপুর উৎসুক মুখে জিজ্ঞেস করল, কোথায় গেছিলে গো?

হোটেলের আশপাশটা ঘুরে দেখে এলাম। মিতিনের ঠোঁটে মৃদু হাসি, উলটো দিকে একটা আয়ুর্বেদিক ম্যাসাজ সেন্টার আছে।ভাবছি কাল সকালে ভাল করে একটা ম্যাসাজ নিয়ে নেব।

সহেলি নড়েচড়ে বসলেন, গায়ের ব্যথা কমবে?

একদিনে কী কমে! তবে নিয়ে দেখতে পারো, আরাম হবে। কেরলের এই ম্যাসাজের দুনিয়াজোড়া নাম। অজস্র ধরনের নির্যাস দিয়ে তেল বানায়।বহু ফরেনার এখানে ম্যাসাজ করাতে আসে।মিতিনের হাসি চওড়া হল, আর-একটা সংবাদ তোমায় দিতে পারি।পাশে একটা গিফট শপও আছে।

শঙ্কা ভুলে সহেলির চোখ ঝিকঝিক, কথাকলি নাচের মুখোশ পাওয়া যাবে?

ভিতরে থাকতে পারে।সামনাসামনি তো দেখলাম না।তবে কাজের জিনিস যদি কাউকে উপহার দিতে চাও,

এখান থেকে ভাল মশলা নিতে পারো।টাটকা এলাচ, লবঙ্গ, দারচিনি, গোলমরিচ প্যাকেট করে করে বিক্রি করছে।

সহেলি রীতিমতো পুলকিত।পারলে এক্ষুনি বেরিয়ে পড়েন।বুঝিয়েসুঝিয়ে নিরস্ত করা হল তাঁকে।কালকের দিনটা তো থাকাই হচ্ছে, আজ ক্লান্ত হয়ে এসে বেরনোর দরকার কী?

পার্থ বলল, নিন, এখন পকোড়া খান।ঠান্ডা হয়ে যাচ্ছে।অবনীদা, আপনার স্যান্ডুইচও তো পড়ে রইল!

হুঁ।খাই।

অবনী স্যান্ডুইচে কামড় বসালেন বটে, কিন্তু মুখখানা কেমন যেন ভেজা বিস্কুটের মতো মিয়োনো।

লক্ষ করে মিতিন বলল, আপনি এত চুপ করে গেছেন কেন অবনীদা? দুপুরের শকটা কি এখনও সামলাতে পারেননি?

আরে, যেতে দিন, যেতে দিন।পার্থ টম্যাটো সসে পকোড়া ডোবাচ্ছে, গেছে তো একটা ফাউতে পাওয়া ব্যাগ। এখন থেকে আপনি আমি ইকুয়াল।আপনার ব্যাগ নেই, আমারটাও গন।

উঁহুঁ, অবনীদারটা আছে।মিনি কফিতে চুমুক দিল, সুনীল নিয়ে গেছে রেবতী ইন্টারন্যাশনাল থেকে।কালই ফোনে জেনে নিয়েছি।

সে যাই হোক, এখন তো কাছে নেই।পার্থ হাসল, আমি একটা অন্য কথা ভাবছিলাম, বুঝলে।যে ব্যাটা ব্যাগটা লুঠ করল, সে নিশ্চয়ই আমায় প্রাণ ভরে গাল পাড়ছে।যা ডাহা ঠকল বেচারা।কী লোকসান, কী লোকসান!

অবনী ভারী গলায় বললেন, লোকানটা তো আমাদেরই হল পার্থ। ওই ব্যাগে তুমি দাবার বোর্ডটাও রেখেছিলে।

সহেলি বললেন, তাই বলো।এই জন্যই তোমার মুখ এমন তোলো হাঁড়ি!

স্বাভাবিক।আমি বেটার পজিশানে ছিলাম।একবার বসতে পারলেই চেকমেট হয়ে যেত।

বললেই হল? চেকমেট অত সোজা?

দেখতেই পেতে সোজা কিনা।

বেশ তো চলুন, এক্ষুনি একটা বোর্ড কিনে আনি।বাজার তো খোলাই আছে।

যাবে? চল।একটা শেভিং সেটও কিনব সঙ্গে।কাল থেকে দাড়ি কামানো হয়নি, গাল কুটকুট করছে।

ঢকঢক কফি গিলে দুই ভায়রাভাই বেরনোর জন্য প্রস্তুত, দরজায় বেল।

পার্থই গিয়েছিল খুলতে।বিস্মিত মুখে বলল, আরে, আপনি?

দরজার ওপারে পি কে জি কুরুপ হাসছেন মিটিমিটি, কথা দিয়েছিলাম পেরিয়ারে দেখা করব, এই দেখুন চলে এলাম।

কী আশ্চর্য, আপনি জানলেন কী করে আমরা এই হোটেলে আছি?

ফিমের রোল ওয়াশ করতে দিয়ে ফিরছিলাম, আপনাদের ড্রাইভারকে দেখতে পেয়ে গেলাম হোটেলের সামনে।

মিতিন ডাকল, বাইরে দাঁড়িয়ে রইলেন কেন? ভিতরে আসুন।

স্মিত মুখে ঢুকলেন কুরুপ।চেয়ারে বসতে বসতে বললেন, অসময়ে এসে ডিসটার্ব করলাম না তো?

কী যে বলেন।আমরা তো আড্ডাই মারছিলাম।..কফি খাবেন?

নো থ্যাঙ্কস।কতক্ষণ এসেছেন আপনারা?

এই তো, ঘন্টাখানেক।আপনি?

জাস্ট বৃষ্টির আগে।কাছেই উঠেছি।হোটেল কুমিলি।

লঙ্গুরের ছবি তোলা হল?

নিলাম গোটাকতক স্ন্যাপ।

আপনি টেলিলেন্স ইউজ করেন? নাকি জুম?

ঠিক নেই।যখন যেটা সুবিধে হয়।..বাই দ্য বাই, আপনাদের মর্নিং ট্রিপ কেমন হল?

খুব খারাপ।পার্থ বলে উঠল, সেই ভোররাত্তির থেকে যা আরম্ভ হয়েছে!

কেন? কী হল?

মুন্নার মাটুপেট্টি দুটো এপিসোডই সবিস্তারে বর্ণনা করল পার্থ।শুনে কুরুপ তাজ্জব, এ হেহে, আপনাদের তো দেখছি খুব ট্রাবল।যাচ্ছে! ...যদি ধরে নেওয়া যায় মাটুপেট্টিতে গুন্ডাটা ভুল মোটরবোট টার্গেট করেছিল... কিন্তু মুন্নার ক্লাবে তো এরকম হওয়ার কথা নয়! আই মাস্ট সে, মুন্নারেই পুলিশে খবর দেওয়া উচিত ছিল।

অবনী বললেন, কিছু তো নিতে পারেনি, তাই ভাবলাম সাতসকালে আর পুলিশের ঝক্কিতে যাই কেন?

কিন্তু দুটো লোকের ওপর আপনাদের তো সন্দেহ হয়েছিল।অন্তুত সেটুকুও রিপোর্ট করতে পারতেন।ধরে নিচ্ছেন কী করে, কেয়ারটেকারকে তারা প্রকৃত পরিচয় দিয়েছে? কেয়ারটেকারের বক্তব্যও বেদবাক্য বলে মেনে নেওয়ার কোন অর্থ হয় না।

মিতিন বলল, কিন্তু লোকদুটো হঠাৎ আমাদের টার্গেট করবেই বা কেন?

কিছু বলা যায় না ম্যাডাম।কত লোকের কত রকম উদ্দেশ্য থাকে।...বাই দ্য বাই, ছিনতাই হওয়া ব্যাগে কোনও দামি জিনিস ছিল না তো?

লাকিলি জাস্ট পাঁচ মিনিট আগে আমার ক্যামেরাটা বের করে কাঁধে নিয়েছিলাম।আর যা ছিল, বলার মতো কিছু নয়।

অবনী আহত মুখে বললেন, কেন, দাবার বোর্ডটা কি ফ্যালনা? যথেষ্ট প্রেশাস।

কোনও স্পেশ্যালিটি ছিল বুঝি? আইভরি-টাইভরির গুটি?

সেটটা প্লাস্টিকেরই। তবে দাম অন্য কারণে। অবনী ফোঁস করে শাস ফেললেন, জানেন, আমি একেবারে জেতার মুখে ছিলাম।আর মাত্র তিনটে চাল, তার পরেই পার্থকে হাত তুলে দিতে হত।

অবনীর গভীর ক্ষতিটাকে কুরুপ সেভাবে অনুধাবন করতে পারলেন না যেন।গম্ভীর মুখে বললেন, মাটুপেট্টির গুন্ডাটা গাড়ি করে পালিয়েছিল বললেন, তাই না?

টুপুর বলল, হ্যাঁ।অ্যাম্বাসাডার।

নাম্বার নোট করেছিলেন?

চেষ্টা করেছিলাম। পারিনি। তবে লোকটাকে এক ঝলক দেখেছি। মিতিন আলগা হাসল, তাতে আর লাভ কী বলুন?

আমার কিন্তু খুব খারাপ লাগছে।কেরলে এসে আপনাদের এসব আজেবাজে ব্যাপার ফেস করতে হচ্ছে..!

সহেলি ম্লান মুখে বললেন, ভাগ্যে আরও কী লেখা আছে কে জানে!

ঘাবড়াবেন না ম্যাডাম।মাইকেলস ইন অত্যন্ত সম্ভ্রান্ত হোটেল, এখানে মুন্নার ক্লাবের মতো ঘটনা ঘটবে না। আর কাল সারাটাদিন আমি আছি আপনাদের সঙ্গে।দেখি, কে আপনাদের কী ক্ষতি করে!

মিতিন হাসি হাসি মুখে বলল, অভয় দিচ্ছেন তা হলে?

আপনাদের তো বলেইছি ম্যাডাম, আমার বাবা ছিলেন শিকারি।রাইফেল হয়তো ধরিনি, তবে বুনো রক্ত তো কিছু আমার মধ্যেও আছে। এটুকু গ্যারান্টি দিতে পারি, আমি থাকতে আপনাদের ধারেকাছে কেউ ঘেঁষতে পারবে না।

অবনী প্রায় গলে গেলেন, সো কাইন্ড অফ ইউ, সো কাইন্ড অফ ইউ।

নিড নট মেনশন। কুরুপ ঘড়ি দেখলেন, এখন চলি। কাল ভোর পাঁচটার মধ্যে রেডি হয়ে যান, আমি এসে পড়ব।

অত ভোরে? পার্থ আঁতকে উঠল, ঘুম ভাঙবে?

জাগতেই হবে। ফার্স্ট ট্রিপ সাড়ে ছটায়, আমরা ফার্স্ট ট্রিপই অ্যাভেল করব। ভোরবেলা জীবজন্তু দেখতে পাওয়ার সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি।রোদ উঠে গেলে শুধু জঙ্গল দেখাই সার হবে।

কুরুপ চলে যাওয়ার পর সহেলি বললেন, দ্যাখে বাপু, একটা কথা বলি।যে যতই গ্যারান্টি দিক, হোটলের যতই সুনাম থাক, আমি কিন্তু ভরসা পাচ্ছি না।আমার মনে হয় আজ রাত্তিরে শোওয়ার অ্যাঞ্জেমেন্টটা একটু বদলানো দরকার।মিতিন, পার্থ আর বুমবুম এই ঘরে শোবে, আমি, টুপুর আর টুপুরের বাবা ওই ঘরে।

কেন? তাতে কী সুরাহাটা হবে?

দুটো ঘরেই ব্যাটাছেলে রইল।চোর এলে তারা ফেস করতে পারবে।

টুপুর ঝনঝন করে উঠল, কী বলছ মা? মিতিনমাসি থাকতে কীসের ভয়?

মিতিন হাসতে হাসতে বলল, এক কাজ করা যাক দিদি।পুরুষমানুষ থাকলে যদি তুমি সাহস পাও, আমরা ঘরে বুমবুমকে নিয়ে নিই! সেও তো ব্যাটাছেলে, না কি?

ঠাট্টা কোরো না।যা বলছি তাই করো।

সহেলিকে আরও কিছুক্ষণ খেপানো চলল।জোর হাসাহাসি হচ্ছে ঘরে।তার মধ্যেই উশখুশ করছিলেন অবনী। হঠাৎ বললেন, এই পার্থ, দোকানে যাবে না?

পার্থ অলস মেজাজে বলল, ছাড়ুন না অবনীদা, আজ সকলে মিলে একটু গপ্পো করি।দাবা নয় আজকের মতো থাক।

দাড়িও থাকবে?

থাকুক না।একদিনে আর কফুট বাড়বে? বলতে বলতে পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বের করল পার্থ। দেশলাই জ্বালিয়ে ধরিয়েছে সিগারেট।কাঠি ফেলার জন্য অ্যাশট্রে খুঁজছে।

উঠে টেবিল থেকে ছাইদান এনে দিল টুপুর।চিনেমাটির সুদৃশ্য বস্তুটি নাড়াচাড়া করতে করতে পার্থ বলল, মাইকেল্স ইনের তো দেখি খুব কেতা!

কেন?

অ্যাশট্রের গায়ে পর্যন্ত হোটেলের ইনিশিয়াল! এম আই!

ভুরু কুঁচকে কথাটা শুনল মিতিন।ভুরুটা তার কুঁচকেই রইল।

৯-১২

কাঁটায় কাঁটায় ভোর পাঁচটায় রিসেপশান থেকে ফোন। মিস্টার পি কে জি কুরুপ এসে গেছেন, অপেক্ষা করছেন লাউঞ্জে।বাইরে তখনও ছায়া-ছায়া অন্ধকার।

সঙ্গে-সঙ্গে ধুমধাড়াক্কা লেগে গেল।ওঠ, ওঠ, ওঠ।সাজ, সাজ, সাজ।রাতে আবার এক পশলা বৃষ্টি হয়েছিল, কুমিলিতে তাপমাত্রা বেশ নেমে গেছে, সকলেই হালকা দেখে গরম কিছু চড়িয়ে নিল গায়ে।যথাসম্ভব দ্রুত তৈরি হয়ে টুপুররা যখন নীচে এল, ঘড়িতে তখন পাঁচটা পঁয়ত্রিশ।

কুরুপ সামনেটায় পায়চারি করছিলেন।টুপুরদের দেখে ব্যস্তসমস্ত ভাবে বললেন, উই আর অলরেডি লেট। গিয়ে এই ট্রিপ ধরতে না পারলে দেড়-দুঘণ্টা বসে থাকতে হবে।

পার্থ বলল, সরি, সরি।আপনাকে অনেকক্ষণ দাঁড় করিয়ে রেখেছি।

সরিটরি পরে হবে।এক্ষুনি চলুন।

ম্যাথুকে বলাই ছিল। কাল রাস্তায় বিচ্ছিরি কাদা লেগেছিল গাড়িতে, এই ভোরেও যত্ন করে ধুয়েমুছে ফেলেছে, বসে গেছে স্টিয়ারিংয়ে।অবনী, সহেলি উঠে পড়লেন চটপট।

মিতিন পার্থকে বলল, তুমি বুমবুমকে নিয়ে দিদি-জামাইবাবুর সঙ্গে এসো, আমি আর টুপুর মিস্টার কুরুপের গাড়িতে যাচ্ছি।উনি একা-একা পাইলট কারের মতো সামনে সামনে যাবেন, এটা মোটেই ভাল দেখায় না।

পার্থ কাঁধ ঝাঁকাল, জো হুকুম।

টুপুর বসল কুরুপের পাশে, মিতিন পিছনের সিটে। আজ সাফারি সুট পরেছেন কুরুপ, ঘিয়ে রঙের। এই ভোরেও তিনি দারুণ ফিটফাট।

গাড়ি স্টার্ট করে কুরুপ বললেন, আশা করি দিনটা আজ ভালই কাটবে।

টুপুর বলল, নিশ্চয়ই।

মিতিন ঝুঁকে কী যেন কুড়োচ্ছিল। রেয়ারভিউ মিররে দেখতে দেখতে কুরুপ জিজ্ঞেস করলেন, কিছু পড়ল ম্যাডাম?

আমার একটা হেয়ার ক্লিপ।পেয়ে গেছি।

একটু একটু করে ফরসা হচ্ছে আকাশ। মেঘ আছে বটে, তবে ভারী কিছু নয়। পাখিরা জাগছে, ভেজা-ভেজা নির্জন রাস্তায় উড়ে বেড়াচ্ছে পিড়িং পিড়িং।অচেনা জায়গায় এমন স্নিগ্ধ ভোর দেখলে প্রাণটা জুড়িয়ে যায়।

টুপুর আনমনে বলে উঠল, আজ কি আবার বৃষ্টি হবে?

কুরুপ বললেন, হতেই পারে।তোমরা ছাতাটাতা নিয়েছ তো?

মার ব্যাগে আছে মনে হয়।

মাত্র একটা?

বাবারও ছাতা ছিল।কোচিতে ফেলে এসেছে।

তাই বুঝি? ছাতা কোচিতেই রয়ে গেল?

টুপুর ব্যাগ ফেলে আসার গল্প শুরু করার আগেই মিতিনের উল্লসিত স্বর, ওই দ্যাখ টুপুর, ডান দিকের অর্জুন গাছটায় দ্যাখ!

কী গো?

একঝাক টিয়াপাখি।এক সঙ্গে উড়ে এসে বসল।বিউটিফুল।

পেরিয়ারে এরকম অনেক বিউটি দেখতে পাবেন ম্যাডাম।কুরুপ হাসছেন, কত যে তাদের রং, কত রকম বাহার।

টুপুর প্রশ্ন করল, পেরিয়ারে অনেক রকম পাখি আছে বুঝি?

অজস্র।অজস্র।কত বার্ডওয়াচার পেরিয়ারে শুধু পাখি দেখতেই আসে।কমন পাখির মধ্যে ভীমরাজ, পাপিয়া, কাঠঠোকরা, ময়না... তারপর ধরো, ডাহুক, মাছরাঙা, সারস, পানকৌড়ি এসব তো চোখে পড়বেই। এ ছাড়া আছে ইয়া লম্বা ঠোঁট ধনেশ, ছাইরঙা জংলি মুরগি...। তা ছাড়া এখানে নীল রঙের টিয়া দেখতে পাওয়া। যায়। এই প্রজাতির টিয়া এখন প্রায় বিলুপ্ত। তবু পেরিয়ারের জঙ্গলে। এখনও চোখে পড়ে। হঠাৎ কোনওদিন হয়তো এখানেও দেখা যাবে না, কে জানে?

পাখি প্রসঙ্গ থেকে পেরিয়ার হ্রদের গল্পে ঢুকে পড়লেন কুরুপ। পেরিয়ার লেক নাকি প্রাকৃতিক হ্রদ নয়, মানুষের তৈরি।কেরলের দ্বিতীয় দীর্ঘতম নদী পেরিয়ারে বন্যা হত প্রতি বছর, ঘরবাড়ি ভেসে গিয়ে নাকাল হত লোকজন। তাই নাকি আঠেরোশো পচানব্বই সালে বাঁধ দেওয়া হয়েছে নদীতে।আর সেই বাঁধের জল ধরে রাখার জন্য কাটা হয়েছে হ্রদ। এই লেককে ঘিরেই ত্রিবাঙ্কুরের মহারাজা গড়ে তুলেছিলেন পেরিয়ার অভয়ারণ্য।সেই অভয়ারণ্যই এখন কেরলের বৃহত্তম জঙ্গল।

কুরুপের গল্প ফুরোতে না ফুরোতে এসে গেছে থেক্কাডি চেকপোস্ট। পেরিয়ার অরণ্যের প্রবেশদ্বার। গেট পেরনোর পর থেকেই দুপাশে হালকা জল।বিশাল উঁচু-উঁচু গাছ, মধ্যিখান দিয়ে পিচরাস্তা।বৃষ্টির জল মেখে কী চকচক করছে গাছগুলো।পাখপাখালির কিচিরমিচিরকে শান্ত বনভূমি মুখর এখন।

আরও খানিকটা গিয়ে গাড়ি দাঁড় করালেন কুরুপ।টয়োটা কোয়ালিসও থেমেছে পিছনে। এই ভোরেও বেশ কয়েকটা জিপ আর প্রাইভেট কার জঙ্গলেহাজির।

টিকিট কেটে বড়-বড় পাথরের চাতাল বেয়ে, উঁচু-উঁচু ধাপি টপকে অনেকটা দূরে দাড়ানা জলযানটায় গিয়ে উঠল সবাই। এবার আর কোচির ভুলটা করেনি, গোড়াতেই উঠে গেছে দোতলায়।উপরে ভাড়া একটু বেশি, তা হোক, ভাল করে দেখা তো যাবে।

মিনিট পাঁচ-সাতের মধ্যেই ছাড়ল লঞ্চ।আঁকাবাঁকা জলপথে জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে ঘণ্টাখানেকের পরিভ্রমণ সেরে লঞ্চ যখন আবার ঘাটে ভিড়ল, টুপুরদের পেটে তখন চনচনে খিদে।লেকের পাড়ে চমৎকার সাজানো-গোছানো রেস্তোরাঁ, নেমেই দুদ্দাড়িয়ে খেতে ছুটল সকলে।ধোসা, ইডলি, পুরি, ব্রেড-ওমলেট সবই মিলবে, যার যা খুশি খাও। কুরুপ নিলেন আপ্পাম, কেরলের নিজস্ব ধোসা। মিতিন আর টুপুর অনিয়ন উত্তাপাম, বাকিরা ডিম-রুটি।গাছে গাছে ঘেরা রেস্তোরাঁর বাইরে হুপহপ ঘুরে বেড়াচ্ছে হনুমানের দল, তাদের দেখতে বারবার ছুটছে বুমবুম। হনুমান কাছাকাছি এলেই পালিয়ে আসছে তড়িঘড়ি। লঞ্চের আরও অনেকে খাচ্ছে রেস্তোরাঁয়, বুমবুমের সাহসের বহর দেখে তারা হেসে খুন।

টুপুর চুপটি করে জঙ্গলটার কথা ভাবছিল। পেরিয়ারের সৌন্দর্যে সে এখনও বিভোর। কী সবুজ, কী সবুজ! সবুজ রং যে এত গাঢ়, এত তীব্র হতে পারে পেরিয়ার না এলে বুঝি জানাই হত নাটুপুরের।জঙ্গলকে ঘিরে

সহ্যাদ্রি পাহাড়, খানিক সমতল বেয়ে জঙ্গল ছড়িয়ে গেছে পাহাড়ে পাহাড়ে, হ্রদের পাড়ে ডুলকি চালে ঘুরে বেড়াচ্ছে হাতির পাল, হঠাৎ হঠাৎ উঁকি দিচ্ছে হরিণ, মায়াবী চোখে তাকিয়ে থাকছে লঞ্চের দিকে, জলে পানকৌড়ির আঁক, মাছরাঙা উড়ে এসে ছোঁ মেরে জল থেকে মাছ তুলে নিল, পাহাড়ের গায়ে গম্ভীর দাঁড়িয়ে বাইসন, সকালের রোদে ঝকঝক করছে তাদের শরীর, মাথার ওপর ট্যাঁ-ট্যাঁ ডেকে উঠল নাম না-জানা পাখি– আহা, পেরিয়ার সত্যিই তুলনাহীন। সবচেয়ে বেশি আকর্ষক বুঝি জলে মাথা তুলে থাকা গাছের গুঁড়িগুলো।পার্থমেসো বলছিল, ওগুলো নাকি জঙ্গল কেটে লেক বানানোর স্মৃতিচিহ্ন।একশো বছরেরও উপর গাছের কঙ্কাল জলে রয়ে গেছে, ভাবা যায়?

অবনী কাউন্টার থেকে একখানা ইংরেজি খবরের কাগজ এনে পড়ছিলেন। হঠাৎই উত্তেজিতভাবে বলে উঠলেন, এই দ্যাখো, দ্যাখো, কোচির সিনাগগের খবরটা কত বড় করে বেরিয়েছে।

কুরুপ মুখে আপ্পাম পুরছিলেন।থমকে গিয়ে বললেন, কোন খবরটা?

সিনাগগের চুরি।

ওটা তো কালই দেখেছিলাম মুন্নারে।

আরও ডিটেলে বেরিয়েছে আজ।সিনাগগের যে ছেলেটি খুন হয়েছে, তার সম্পর্কেও নিউজ আছে।ছোকরার নাম বিক্রমন।খুব নাকি জুয়ার নেশা ছিল ছোকরার, প্রচুর নাকি ধারধোরও করেছে।পুলিশ সাসপেক্ট করছে জুয়ার আড্ডারই কেউ একজন ওকে দিয়ে চুরি করিয়েছিল গ্রেট স্ক্রল টা।জানাজানি হওয়ার পর সেই মেরে দিয়েছে বিক্রমনকে। রিভলভারের গুলিতে মারা গেছে ছেলেটা। ডেডবডি পড়ে ছিল একটা অটোরিকশার সিটে।চিতুর রোডের লাগোয়া কোন গলিতে।

সহেলি বিস্মিত স্বরে বললেন, আমরা চিতুর রোডের হোটলে ছিলাম না?

হুম।ছেলেটারও মনে হয় ওইদিকেই বাড়ি।পুলিশ আরও কিছু ক্লু পেয়েছে।ছেলেটা যে জুয়ার আড্ডায় যেত, ওখানে নাকি এক দাগি ক্রিমিনাল আসত মাঝেমধ্যে। লোকটা নাকি এক সময়ে পেশাদার গাইড ছিল, ফরেনারদের নিয়ে কেরলে টুর করাত।বছর সাত-আট হল প্রফেশান বদলে অ্যান্টিক চোর হয়েছে।একবার চেন্নাইতে ধরা পড়েছিল, মিউজিয়াম থেকে রেয়ার নটরাজ চুরি করতে গিয়ে।অনেককাল সে কেরলের বাইরে ছিল।সম্প্রতি তাকে কোচিতে দেখা গেছে বলে তাকেই সন্দেহ করছে পুলিশ।

পার্থ জিজ্ঞেস করল, তা তাকে ধরছে না কেন?

নিশ্চয়ই খুঁজে পাচ্ছে না, তাই।

কুরুপ প্রশ্ন করলেন, লোকটার নাম দিয়েছে কাগজে?

অপরাধ জগতে আসার আগে সে ছিল টি জোসেফ।এখন নাকি তার অষ্টোত্তর শত নাম।তামিলনাড়ুতে তিনি সেলভান, অন্ধ্রে মুথুস্বামী, কর্নাটকে আয়াপ্পান ...

সেলভান নামটা যেন শোনা-শোনা লাগছে।কোনও এক মন্দিরের মূর্তি চুরির কেসে সম্ভাব্য অপরাধী হিসেবে নামটা বোধ হয় কাগজে বেরিয়েছিল।কুরুপের ভুরুতে ভাঁজ, বছর দু-আড়াই আগে।

তার মানে তিনি তা স্বনামধন্য ব্যক্তি! মিতিন বলে উঠল, দু- আড়াই বছর পরেও নামটা যখন লোকের মনে থাকছে!

অবনী বললেন, খবরটা থেকে একটা ইনফরমেশান কিন্তু ক্লিয়ার মিতিন।

কী বলুন তো?

তোমার ডিকশানই ঠিক। সাইমন পেরেজ বা জোস হ্যালেগুয়া কিন্তু এই চুরির সঙ্গে কোনওভাবেই যুক্ত নন। সিনাগগের রাবি বা কেয়ারটেকারকে যে আমরা সন্দেহ করছিলাম তার কোনও ভিত্তি নেই।

কথাটা ইংরেজি-বাংলা মিশিয়ে বলছিলেন অবনী, মর্মার্থ অনুধাবন করে কুরুপও বেশ আশ্চর্য হয়েছেন। বললেন, এক্সকিউজ মি, একটা প্রশ্ন না করে পারছি না। চুরিটা নিয়ে আপনারা এত এক্সাইটেড কেন?

পার্থ বলল, কারণ, চুরিটা প্রায় আমাদের চোখের সামনে ঘটেছে।

অ্যাঁ?

না, চোর আমাদের দেখিয়ে চুরি করেনি। আমরা পরশু, আই মিন রোববার, সিনাগগের কর্তাব্যক্তিদের জপিয়ে-জাপিয়ে গ্রেট স্ক্রল দেখতে গেছিলাম এবং তখনই চুরিটা প্রথম ডিটেক্টেড হয়।

হা, কাগজে কাল দেখছিলাম বটে। একদল বাঙালি টুরিস্ট সিনাগগে গিয়েছিলেন, তখনই .... আপনারাই তারা?

ইয়েস স্যার। শুধু মুন্নার মাটুপেট্টি নয়, কোচিতেও আমাদের একটা খটোমটো অভিজ্ঞতা হয়েছে। বলতে বলতে পার্থ থেমে গেল আচমকা। চোখ সরু করে ভাবছে কী যেন, কাটায় গেঁথেও ওমলেট মুখে পুরছে না। তারপর নিজের মনেই বিড়বিড় করে। উঠল, আচ্ছা মিতিন, এমন কি হতে পারে ...?

মিতিন খবরের কাগজটা টেনে নিয়ে দেখছিল। চোখ তুলে বলল, কী?

সেদিন সিনাগগে থাকার কারণেই আমরা কোনওভাবে চুরিটার সঙ্গে জড়িয়ে পড়িনি তো? হয়তো আমাদের অজ্ঞাতসারেই? হয়তো তার আফটার এফেক্ট হিসেবেই মুন্নারে চুরির অ্যাটেমপ্ট? মাটুপেট্টির ছিনতাই?

হতে পারে। মিতিন ঠোঁট ওলটাল, না-ও হতে পারে।

তোমার লজিক কী বলছে?

এখনও ওই অ্যাঙ্গেলে ভাবিনি।

ভাবো। ব্রেনটা খাটাও। আমার তো মন বলছে ডালমে কুছ কালা হ্যায়।

কুরুপ উদ্বিগ্ন মুখে বললেন, কেন আপনার ওরকম মনে হচ্ছে মিস্টার মুখার্জি?

ওর কথা বাদ দিন মিস্টার কুরুপ। মিতিন হেসে উঠল, আমার হাজব্যান্ড সবেতেই বিপদের গন্ধ পায়।

কুরুপ মাথা নাড়লেন, ম্যাডাম, আমি তবু বলব সাবধানের মার নেই। বিশেষত মিস্টার মুখার্জির মনে যখন একটা খটকা জেগেছে। আমার তো মনে হয় রাস্তাঘাটে আপনাদের ঘোরাফেরা বেশি না করাই ভাল।

মিতিন আরও জোরে হেসে উঠল, কেন, আপনি তো আছেন সঙ্গে।

তা আছি। কুরুপও হেসে ফেললেন, তবে আমি তো আর আজকের পরে থাকছি না। এখান থেকে আপনারা যাচ্ছেন কোথায়? আলেপ্পি তো?

সেরকমই তো প্ল্যান আছে। কাল সকালে রওনা দিয়ে ভায়া কোট্টায়াম আলেপ্পি। তার পরের দিন কোভালাম, তার পরের দিন কন্যাকুমারিকা।

যেখানেই যান, একটু অ্যালার্ট থাকবেন।

সহেলি কাতর স্বরে বললেন, আপনিও তিনটে দিন আমাদের সঙ্গে থাকুন না মিস্টার কুরুপ।আমার বোন তো মরে গেলেও টুর ক্যানসেল করবে না, আপনি থাকলে আমি অন্তত মনে একটু জোর পাই।

আপনাদের সঙ্গ তো আমার খুব ভালই লাগছে ম্যাডাম। কিন্তু আমাকে যে কাল সকালে পারাম্বিকুলম স্যাংচুয়ারির পথে বেরিয়ে পড়তে হবে। আমার এক পুরনো বন্ধু, তিনিও একজন ওয়াইল্ড লাইফ ফোটোগ্রাফার, পারাম্বিকুলমে আমার জন্য ওয়েট করবেন। আমরা দুজনে মিলে কোচিতে একটা এগজিবিশনের প্ল্যান করছি, তার থিম নিয়ে জরুরি আলোচনা আছে।

অতঃপর আর তো অনুরোধ চলে না, সহেলি চুপ মেরে গেলেন।খাওয়া শেষ করে উঠে পড়ল সবাই।কুরুপই বিল মেটাতে যাচ্ছিলেন, পার্থ জোর করে আটকাল তাঁকে।

এবার কুরুপের গাড়িতে মিতিনের বদলে পার্থ। মাইকেল্স ইনে পৌঁছে আপাতত বিদায় নিলেন কুরুপ। টুপুররা এখন বিশ্রাম-টিশ্রাম করুক, তিনি আবার চারটে নাগাদ এসে মশলা বাগান দেখাতে নিয়ে যাবেন।

রুমে এসে মিতিন সহেলিকে বলল, কী দিদি, এখন কী প্ল্যান?

কিছুই না।স্নানটান সারব।

এমন সুন্দর সকালটা বয়ে যাবে? সবে দশটা বাজে; একটু মেন মার্কেটের দিকে গেলে হত না?

খেপেছিস? শুনলি না, মিস্টার কুরুপ বেরোতে বারণ করলেন।যদি বাজার যেতে হয় তো বিকেলে যাব, যখন ভদ্রলোক সঙ্গে থাকবেন।

আহা, ভদ্রলোকের আর খেয়েদেয়ে কাজ নেই, তোমার সঙ্গে দোকানে দোকানে টোটো করবেন! দৃষ্টিকটু বলে তো একটা কথা আছে, না কি?

মোটেই না।মিস্টার কুরুপ অতি সজ্জন মানুষ, তিনি কিছু মনে করবেন না।

টুপুর ফস করে বলল, আমরা এখন ম্যাসাজ করাতে যেতে পারি।

মিতিন বলল, কারেক্ট।সে তো দোরগাড়ায়।ভাল করে ম্যাসাজ নিলে শরীর মন ঝরঝরে হয়ে যাবে।তোর মা-র আশা করি ওখানে যেতে আপত্তি হবে না?

সহেলি যেন ঈষৎ দোলাচলে।বললেন, এত কাছাকাছি কোনও বিপদ নেই, কী বল?

কোথাও বিপদ নেই দিদি।আমি তো আছি, চলে এসো।

বেরনোর সময়ে উলটো দিকের ঘরে একবার উঁকি দিয়ে এল টুপুর।রুমে ঢোকার আগে পার্থমেসো ফুড়ুৎ করে বেরিয়ে দাবার বোর্ড কিনে এনেছে, দুই মহারথী আবার রণক্ষেত্রে মুখোমুখি। বুমবুম যথারীতি ডুবে আছে কার্টুন চ্যানেলে।হাতে চিপসের প্যাকেট।

মালিশাগারে এসে টুপুর-সহেলিকে ঢুকিয়ে দিয়ে মিতিন বলল, তোরা মা-মেয়ে টেবিলে শুয়ে পড়, আমি একটু আসছি।

কোথায় যাচ্ছ?

একটা দরকারি কাজে।ঘন্টাখানেকের মধ্যে এসে পড়ব।

মার্কেটিং করবে?

ওটা তো তোর মা-র ডিপার্টমেন্ট।অন্য কাজ।পরে বলব।

টুপুরের কেমন যেন ধন্দ লাগল।কাল রাত থেকে বেশ রহস্যময়ী হয়ে গেছে মিতিনমাসি।বারবার কেন যেমন অন্যমনস্ক হয়ে যাচ্ছে।অনেক রাত অবধি কাল দাঁড়িয়েছিল ব্যালকনিতে।আজও লঞ্চে ঘোরার সময়ে উচ্ছাস দেখাচ্ছিল না বড় একটা।ভাবছে কী যেন!

নতুন কোনও বিপদের গন্ধ পাচ্ছে নাকি মিতিনমাসি? বলে না কেন? সবাই ভয় পেয়ে যাবে, তাই? হতে পারে।হতেই পারে।

.

১০.

লতানে গাছের নরম ডালটাকে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখছিল টুপুর। বড়-বড় পাতার পাশে থোকা-থোকা দানা ঝুলছে।সবুজ-সবুজ।কাটা একেবারেই লিকলিকে।সবুজ দানাগুলো শুকিয়ে কালো হয়ে গেলেই গোলমরিচ। কেরলের কালোসোনা।সেই কোচি থেকেই রাস্তার দুধারে এরকম লতানে গাছ এনতার দেখেছে টুপুর, বড় কোনও গাছের গুঁড়িকে বেড় দিয়ে মাটি থেকে উঠে গেছে।ইস, আগে জানলে এরকম দানাসুষ্ঠু লতা আরও কিছু সংগ্রহ করে রাখা যেত।

কুরুপ আজ দু-দুটো মশলার বাগানে ঘুরিয়েছেন টুপুরদের।একসঙ্গে এত রকম মশলার গাছ দেখা টুপুরের এই প্রথম।শুধু টুপুর কেন, তাদের কে-ই বা দেখেছে আগে! হলুদ লঙ্কা জিরে আদা থেকে শুরু করে সেই ভ্যানিলা গাছ পর্যন্ত।যে গাছের ফল থেকে ভ্যানিলা হয়, তার পাতাতেও কী সুগন্ধ। লম্বা লম্বা সুচোলো পাতাওয়ালা এলাচ গাছের গোড়ায় ছোট্ট-ছোট্ট এলাচ ফলে আছে, লবঙ্গ ফুটে আছে ডালে-ডালে— দেখতে ভারী মজা লাগে।দারচিনি গাছের শুকনো পাতাই যে তেজপাতা, এ তথ্যও তো আজ টুপুরের জ্ঞানভাণ্ডারে জমা হল।

যাওয়া হয়েছিল কফি বাগানেও ঝোপ-ঝোপ কফিগাছ থেকে অনেক কটা ফল ছিঁড়ে এনেছে টুপুর। ওই ফলের বীজ রোস্ট করে, গুঁড়িয়ে, বাড়িতেই কফি তৈরি হয় কিনা দেখবে।

বুমবুমও পাতা জোগাড় করেছে প্রাণ ভরে।হলুদগাছের পাতা, আদাপাতা, এলাচপাতা, লবঙ্গপাতা, এমনকী কফি-কোকোর পাতাও।কোনটা কী পাতা গুলিয়ে ফেলছে বারবার। একটা বড়সড় পাতা দেখিয়ে জিজ্ঞেস করল, এটা যেন কীসের রে দিদিভাই? হলুদ?

একটু ছিঁড়ে শুকে দ্যাখ না।গন্ধেই মালুম হবে।

এএএ, আমি পাতা ছিড়বই না।

পার্থ বিছানায় শুয়ে ঠ্যাং নাচাচ্ছিল। মশলা বাগান ঘুরে কুমিলির বাজারে যাওয়া হয়েছিল সন্ধেবেলা। দোকানে-দোকানে চক্কর খেয়ে সে এখন ক্লান্ত।অলস ভঙ্গিতে বলল, এত পাতা নিয়ে কী করবি র‍্যা?

কলকাতায় বন্ধুদের দেখাব।

তদ্দিনে তো শুকিয়ে ঝুরঝুরে হয়ে যাবে!

বইয়ের খাঁজে রেখে দেব।রাংতার মতো।ঠিক থাকবে।

অবনী ব্যালকনিতে চেয়ার নিয়ে জিরোচ্ছিলেন এতক্ষণ। উঠে এসে বললেন, কেরলের মেন-মেন আইটেম আমাদের তা হলে দেখা হয়ে গেল। পাহাড়, লেক, জঙ্গল, মশলাবাগান, কফিবাগান। এখন শুধু কোভালামের সমুদ্রটাই বাকি। আর আলেপ্পিতে নৌকাবিহার।

টুপুর বলল, এখনও রবার প্ল্যানটেশান দেখিনি বাবা।

সে তো কাল আলেপ্পি যাওয়ার পথে কোট্টায়ামের আগে পড়বে। কুরুপ তো বলছিলেন মাইলের পর মাইল জুড়ে রবার বন।

বুমবুম চোখ ঘুরিয়ে জিজ্ঞেস করল, আচ্ছা, রবার কি গাছে ফলের মতো ঝোলে? পার্থ বলল, তা হলে তো আর চিন্তা ছিল না। তুই যা রবার হারাস বাড়িতে একটা রবারগাছ পুঁতে রোজ একটা করে তোকে রবার ছিঁড়ে দিতাম।

টুপুর বলল, তুই একটা বুদ্ধু। রবার গাছের গুঁড়ি চিরে একটা প্লাস্টিক বেঁধে দেওয়া হয়। ওই প্লাস্টিকের থলিতে গাছের রস গড়িয়ে-গড়িয়ে পড়ে, সেই রসই প্রসেস করে বানানো হয় রবার। মনে থাকবে?

সহেলি একগাদা মশলার প্যাকেট কিনেছেন। প্যাকেটগুলো নাড়াচাড়া করতে করতে বললেন, তোমাদের গালগল্প শেষ হবে না? নটা তো বাজল, খেতে যাবে কখন?

অবনী বললেন, দাঁড়াও, মিস্টার কুরুপ আসুন। তাঁকে ডিনারে নেমন্তন্ন করে আমরা আগেভাগে খেতে বসে যাব?

ওমা, তাই তো। আমার খেয়ালই ছিল না, সহেলি জিভ কাটলেন, কখন আসবেন তিনি?

এসে তো পড়ার কথা। কেন যে দেরি করছেন? বলতে-না-বলতেই দরজা ঠেলে, কুরুপ নয়, মিতিনের প্রবেশ। এতক্ষণ অন্য রুমে যোগব্যায়াম সারছিল। মুখটুখ ধুয়ে তরতাজা হয়ে এসেছে।

ঘরে ঢুকে দরজা হাট করে দিল মিতিন। সোজা এসে বসল বিছানায়। ব্যক্তিত্বমাখা স্বরে বলল, কাল আমাদের কটায় রওনা হওয়ার কথা?

তুইই তো বলেছিলি আটটা সাড়ে আটটায় বেরোব। সহেলি জবাব দিলেন, আলেপ্পিতে লাঞ্চ হবে।

প্রোগ্রামটা একটু বদলে যাচ্ছে। আমরা বেরোব কাল সাতটার মধ্যে। এবং আমাদের প্রথম গন্তব্যস্থল কাল আলেপ্পি নয়, কোচি।

কেন?

সব কেনর উত্তর সঙ্গে সঙ্গে হয় না দিদি। কারণটা কাল বিকেলে জানতে পারবে।

কয়েক মুহূর্তের জন্য গোটা ঘর স্তব্ধ। সহেলি, অবনী চোখ চাওয়াচাওয়ি করছেন। পার্থর দৃষ্টিতে বিস্ময়। টুপুর হতবাক হয়ে দেখছে মিতিনমাসিকে। চেষ্টা করছে মাসিকে পড়ার।

সহেলি কাঁপাকাঁপা গলায় জিজ্ঞেস করলেন, আমায় একটা সত্যি কথা বলবি মিতিন? আমাদের সঙ্গে শত্রুতাটা করছে কে? মুন্নারের সেই লোকদুটো?

উহুঁ, আর কোনও প্রশ্ন নয়। শুধু কয়েকটা কথা মগজে ভরে রাখো। আমি যা বলব, নির্দ্বিধায় তাই করবে। ভয় পেয়ো না, প্যানিকড হওয়ার কোনও কারণ নেই। সহজভাবে থাক। হাসো, কথা বলো। কী নিয়ে আলোচনা হচ্ছিল তোমাদের?

বুমবুম বলল, রবার গাছ।না না, মিস্টার কুরুপ।

হ্যাঁ, ভদ্রলোক তো এসে পড়বেন।চলো , নীচে গিয়ে ততক্ষণ অর্ডার-টর্ডার দিই।পার্থ, নামার আগে দুটো রুমের দরজাই ভাল করে লক করে পকেটে চাবিদুটো নিয়ে এস।

মিতিনের কথার মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারছিল না কেউ।ক্ষণে ক্ষণে বাচনভঙ্গি বদলাচ্ছে মিতিন।এই হাসি হাসি, তো এই থমথমে।তবে কেউ আর বিশেষ ঘাঁটালও না তাকে।গুটিগুটি নেমে এসেছে রেস্তোরাঁয়।

কুরুপের জন্য বেশিক্ষণ প্রতীক্ষা করতে হল না।টুপুররা মেনুকার্ড খোলার আগেই পৌঁছে গেছেন কুরুপ। লাউঞ্জে তাঁকে দেখতে পেয়েই হাত নেড়ে ডাকল মিতিন, চলে আসুন, আমরা এখানে!

নেভি ব্লু রঙের সুট পরে এসেছেন কুরুপ, গলায় মেরুন টাই।চাপ-চাপ কোঁকড়া চুলে জেল লাগিয়েছেন, ব্যাকব্রাশ করা চুল বেশ পেতে রয়েছে।বসেই রসিকতা করে বললেন, লাস্ট সাপার টুগেদার।হা হা।

দুটো টেবিলে ভাগাভাগি করে বসা হয়েছে।একটাতে মিতিন, টুপুর, পার্থ, আর মিস্টার কুরুপ।হাতপাচেক তফাতে বাকি তিনজন।অবনী ওই টেবিল থেকে উত্তর দিলেন, কিন্তু এখানে জুডাসটি কে? আর আমাদের মধ্যে কেই বা জেসাস ক্রাইস্ট?

তোফা বলেছেন তো? এই জন্যই তো আমি বাঙালিদের এত পছন্দ করি।এই সেন্স অফ হিউমারের জন্য।

পার্থ বলল, তা হলে বাঙালির রসনার কথাও নিশ্চয়ই জানেন?

বিলক্ষণ।বাঙালি খেতে খুব ভালবাসে।কলকাতার মতো এত ভ্যারাইটি খাবারের দোকান আমি আর কোনও মেট্রোপলিসে দেখিনি।

তা হলে এবার খানার অর্ডার প্লেস করি?

নিশ্চয়ই।

দক্ষিণ ভারতীয় নয়, উত্তর ভারতীয়ও নয়, কুরুপের আগ্রহ চিনা খাবারে।আইটেম পছন্দ করল টুপুর। অ্যাসপারাগাস সুপ, লেমন চিকেন, গার্লিক প্রন, মিক্সড চাউমিন, সি ফুড ফ্রায়েড রাইস ...।

অর্ডার দানের পর্ব চোকার পর পার্থ আয়েশ করে সিগারেট ধরিয়েছে।প্যাকেটটা দেখিয়ে কুরুপকে বলল, আপনি তো এ রসে বঞ্চিত, তাই না?

এককালে খেতাম দুএকটা।ছেড়ে দিয়েছি।

ভালই করেছেন।পয়সাও বাঁচছে।ফুসফুসও।

মন্তব্যটা মিতিনের।পার্থ তেরচা চোখে মিতিনকে একবার দেখে নিয়ে প্যাকেট পকেটে পুরল।অ্যাশট্রেখানা সামনে টেনে নিয়ে কুরুপকে বলল, আপনার এগেনস্টে আমার কিন্তু একটা অভিযোগ আছে।

কুরুপের চোখ সরু।

অত সিরিয়াস হওয়ার কিছু নেই।পার্থ হো-হো হেসে উঠল,আপনার ওয়াইল্ড লাইফ ফোটোগ্রাফির কোনও স্যাম্পল কিন্তু আমাদের দেখালেন না!

কুরুপ অপ্রস্তুত মুখে বললেন, এক্সট্রিমলি সরি।ফিল্ম তো আমি যেখানে-সেখানে প্রিন্ট করাই না, শুধু ওয়াশটা করিয়ে রাখি।তা আপনাদের ঠিকানাটা দিয়ে দিন না, পাঠিয়ে দেব।

খেয়ে উঠেই লিখে দিচ্ছি।আর হ্যাঁ, যদি কখনও কলকাতায় আসেন অবশ্যই আমাদের সঙ্গে দেখা করবেন।

সে আর বলতে! কুরুপের ঠোঁটে শিষ্ট হাসি, বাই দ্য বাই, আপনারা কাল কটায় বেরোচ্ছেন?

ভেবেছিলাম বেলায় স্টার্ট করব।কিন্তু আমাদের টুর প্রোগ্রামটা সামান্য বদলে গেছে।মিতিন বলে উঠল, কাল আমরা স্ট্রেট আলেপ্পি যাচ্ছি না।

সে কী? কুরুপ অবাক, কোথায় যাবেন তা হলে?

আমাদের কাল একবার কোচি ফিরতেই হবে।একটা প্রবলেমে পড়ে গেছি।

কী প্রবলেম?

আর বলবেন না, আমাদের এবারের টুরে শুধুই হ্যাজার্ড।আমার হাজব্যান্ডের যে ব্যাগটা মাটুপেট্টিতে ছিনতাই হল, হুবহু একইরকম আর-একটা ব্যাগ ছিল আমার জামাইবাবুর।উনি তো একটু আলাভোলা টাইপ, ব্যাগটা কোচিতে ফেলে এসেছেন।রেবতী ইন্টারন্যাশনাল হোটেলে।ওই লাল ব্যাগে অনেক টুকিটাকি জিনিসের সঙ্গে জামাইবাবুর ক্রেডিট কার্ডটাও রয়ে গেছে।বোঝেনই তো, আজকাল বেশি ক্যাশ নিয়ে কেউ বেরোয় না, সুতরাং ক্রেডিট কার্ডটা তো

কী কাণ্ড! ব্যাগ হোটেলেই রয়ে গেল? ফেরত পাবেন?

হ্যাঁ।হোটেলে ফোন করে দিয়েছি।

তার মানে সেই রেবতী ইন্টারন্যাশনালে ছুটবেন?

না।জামাইবাবুর এক ছাত্র থাকে কোচিতে, তাকে বলে দেওয়া হয়েছিল, সে ব্যাগটা কালেক্ট করে নিজের জিম্মায় রেখে দিয়েছে।আমরা অবশ্য কোচিতে বেশিক্ষণ স্টে করব না, জামাইবাবুর ছাত্রকে বলা আছে, সে ঠিক বিকেল তিনটেয় ব্যাগ নিয়ে দরবার হল গ্রাউন্ডে দাঁড়িয়ে থাকবে।ব্যাগ তুলে নিয়েই আমরা চলে যাব আলেপ্পি।

কাল তিনটেয়? কুরুপকে ঈষৎ চিন্তিত দেখাল, তার মানে কাল আপনাদের গোটা দিনটাই নষ্ট।সন্ধের আগে আলেপ্পি পৌঁছনো হচ্ছে না তা হলে?

কী করা যাবে বলুন? ভুলের খেসারত।ভেবেছিলাম এখান থেকে কোট্টায়াম হয়ে বাঁয়ে আলেপ্পি ঘুরে যাব। এখন ডাইনে উজান কোচি গিয়ে আবার ফেরা।মাঝখান থেকে কন্যাকুমারিকা এবার হয়তো আর হল না।

হুঁ।টুরে একটা দিন চলে যাওয়া মানেই তো প্রোগ্রামের বারোটা।

টুপুর অনেক কষ্টে সংযত রাখল ঠেলে ওঠা বিস্ময়টাকে।পার্থমেসোও মুখটাকে ভাবলেশহীন করে রেখেছে। তবে তারও যে ভিতরে চমক জাগছে, এ টুপুর হলপ করে বলতে পারে।কালই মিতিনমাসির কথা শুনে মনে হল ব্যাগ নিয়ে ভাবাভাবির প্রয়োজন নেই, পার্থমেসোও তো টাকাপয়সায় টান পড়বে না বলে অভয় দিয়ে রেখেছে, আজ কেন মিতিনমাসির গলায় অন্য সুর?

নৈশাহারের পরে আরও কিছুক্ষণ গল্পগুজব করলেন কুরুপ।ওঠার সময়ে কুরুপ বললেন, কোট্টায়াম রুটে একটা ফাইন হিল রিসর্ট পড়বে।পিরমেড।অলটিচিউড বেশি নয়, তিন হাজার ফিট।তবে সিনিক বিউটি তাকিয়ে দেখার মতো।পারলে ওখানে একটু দাঁড়িয়ে যাবেন।

মিতিন বলল, সেরকম ইচ্ছে একটা আছে বটে।তাই তো সাতটার মধ্যে বেরোচ্ছি।এক-দুঘণ্টা পিরমেডে

হল্টও করতে পারি।আপনিও তো সকালেই রওনা দিচ্ছেন?

কাকভোরে।আমার অনেকটা রাস্তা।ইডুক্কি ডিস্ট্রিক্ট পার হয়ে ত্রিচুর ছুঁয়ে সেই পালাক্কাড় জেলা।ঘণ্টাদশেক তো লাগবেই।

উইশ ইউ এ হ্যাপি জার্নি।

সেম টু ইউ।টুরের বাকি দিনগুলো আপনাদের নিশ্চিন্তে কাটুক।

কুরুপকে বিদায় জানিয়ে ঘরে এসে শুরু হল গোছগাছ।সারাদিনে যা-যা বেরিয়েছে, সহেলি একটা-একটা করে তুলছেন। তিন শিশি মালিশের তেল কিনেছিলেন, যত্ন করে মুড়লেন প্লাস্টিকে, চালান করলেন সুটকেসের তলায়।

মিতিন ব্যালকনিতে।চাপা গলায় পার্থর সঙ্গে কী যেন আলোচনা চলছে।টুপুর ব্যালকনিতে আসামাত্র থেমে গেল কথা।

টুপুর আর কৌতূহল ধরে রাখতে পারল না, কেসটা কী বলে তো? কী হয়েছে?

কীসের কী?

মনে হচ্ছে কোনও গড়বড় আছে?

আছে।

আমরা নিশ্চয়ই শুধু ব্যাগ কালেক্ট করতে কোচি ফিরছি না?

অবশ্যই না।

তা হলে?

মিতিনের ঠোঁটে চিলতে হাসি উঁকি দিয়েই মিলিয়ে গেল, তোর কী মনে হয়?

আমার মনে হচ্ছে সামথিং রিলেটেড টু সিনাগগ।তুমি বোধ হয় কেসটার কোনও সলিউশান পেয়েছ!

গুড গেস।তোর ব্রেনে গ্রে ম্যাটার বাড়ছে।তা সলিউশানটা যে কী, কিছু আন্দাজ করতে পারছিস?

টুপুর মাথা চুলকোল, নাহ।

ঘরে গিয়ে ভ্যানিটি ব্যাগখানা নিয়ে এল মিতিন।চেন খুলে ছোট্ট একটা দাবার খুঁটি বের করেছে, এটা কী?

কালো বোড়ে।

দাবা খেলায় বোড়ের পাওয়ার সবচেয়ে কম।আবার ওই বোড়েই কখনও কখনও এগোতে এগোতে মন্ত্রী বনে যায়।তখন কিন্তু তার ক্ষমতা অসীম, একাই কিস্তি মাত করতে পারে।কী বুঝলি?

টুপুর অস্থির হল, কেন হেঁয়ালি করছ মিতিনমাসি? খুলে বলেই না।

উহুঁ, সারারাত শুয়ে-শুয়ে ভাব। শুধু খেয়াল রাখিস, কাল কিন্তু ছটার মধ্যে উঠতে হবে। বলতে বলতে পার্থকেও তাগাদা লাগাল মিতিন, তুমিও আর দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে সিগারেট ফুঁকো না।তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়ো।

রেলিংয়ে হেলান দিয়ে পার্থ কী যেন ভাবছিল। দূরমনস্ক স্বরে বলল, যাই।

.

১১.

বেরনো হয়েছিল সকাল-সকালই। কিন্তু কোট্টায়ামের দিকে তিনচার কিলোমিটার গিয়েই চমক। দুম করে ম্যাথুকে গাড়ি ঘোরাতে বলল পার্থ, শাঁইশাঁই কুমিলি ফিরে ধরল মুন্নারের পথ। সেদিকেও গেল না বেশি দূর, পুট্টাডি নামের এক ছোট্ট জনপদ পার হওয়ার পরই বাঁদিকের একটা রাস্তায় ঢুকে পড়ল কোয়ালিস।

পার্থ ঘাড় ঘুরিয়ে মিতিনকে জিজ্ঞেস করল, কী, এই রুট ঠিক আছে? চলবে? নো মুন্নার, নো কোট্টায়াম, মধ্যিখান দিয়ে সুড়ুত গলে যাব।

মিতিন বলল, পারফেক্টলি অল রাইট। তোমার ম্যাপ মুখস্থ করা সার্থক।

অনেকক্ষণ ধরেই সন্দিগ্ধ চোখে পার্থ-মিতিনের কাণ্ডকারখানা লক্ষ করছিলেন অবনী। বলে উঠলেন, তোমরা কী চাইছ বলে তো? একবার এ-রাস্তা, একবার ও-রাস্তা ...? আমরা ভায়া কোট্টায়াম যাচ্ছি না কেন?

আপনার শ্যালিকা নতুন রাস্তা এক্সপ্লোর করতে চায় অবনীদা। বলছে বাঁধা রুটে বেড়ানো আর ভাল লাগছে না।

টুপুরের মোটেই বিশ্বাস হল না কথাটা। গাল ফুলিয়ে বলল, পিরমেড‌ও নিশ্চয়ই এ-রুটে পড়বে না?

হয়তো তার চেয়েও বেটার জায়গা দেখতে পাবি। ইডুক্কির জঙ্গল ছুঁয়ে যাব, পেরিয়ার নদী পার হব, পাহাড় অরণ্য কফিবাগান সবই পড়বে পথে এই বা মন্দ কী?

কেন শাক দিয়ে মাছ ঢাকছ পার্থ? অবনী বেশ অপ্রসন্ন, তোমাদের মতলবটা কী একটু ঝেড়ে কাশো তো।

শুনবেনই? ঘাবড়ে যাবেন না তো?

না শুনলেই কি টেনশান কমবে?

আমি বলছি। মিতিন পার্থকে থামাল। শান্ত গলায় বলল, মাটুপেট্টির ঘটনার খলনায়কটিকে আমি পেরিয়ারে দেখেছি অবনীদা।

সে কী রে? সহেলি শিউরে উঠলেন, এমন সাংঘাতিক একটা খবর তুই চেপে রেখেছিস? পুলিশে জানাসনি কেন?

বেড়াতে এসে বারবার ঝুটঝামেলায় যাওয়ার দরকার কী? তার চেয়ে চুপচাপ কেটে পড়াই কি ভাল নয়? তাই বেছে নিলাম একটা অড রুট, যে-পথে টুরিস্টরা সচরাচর আসে না। কোট্টায়ামের রাস্তায় গিয়েও গাড়ি ঘুরিয়ে দেখে নিলাম লোকটা আমাদের ধাওয়া করছে কিনা। লোকটা যদি কোনওভাবে টের পেয়েও থাকে আমরা আজ সকালে পেরিয়ার ছাড়ছি, তা হলেও আগেভাগে গিয়ে পথে কোথাও ওয়েট করে তার লাভ হবে না। ওদিকে যদি বেচারা হাপিত্যেশ করে বসেও থাকে, আমরা এদিক দিয়ে ধাঁ।

ঠিক বলছিস তো রে?

হ্যাঁরে বাবা, হ্যাঁ। মিতিন চোখ ঘোরাল, কী অবনীদা, এবার শাকের আড়ালে মাছ দেখতে পাচ্ছেন তো?

হুম। অবনীর মুখে গালভরা হাসি, জব্বর ঘোড়ার চালটা দিয়েছ কিন্তু।

দাবা খেলা আমিও অল্পস্বল্প জানি অবনীদা।

বটেই তো।তোমায় কি আমি হেলাফেলা করেছি কখনও? তা এবার আমায় আজকের প্রোগ্রামটা একটু খুলে বলো তো?

জানেনই তো, কোচি গিয়ে তিনটের সময় সুনীলের কাছ থেকে ব্যাগ কালেক্ট করব, তারপর যাত্রা টু আলেপ্পি।

জার্নিটা খুব বেশি হয়ে যাবে না? তার চেয়ে আজ রাতটা কোচিতে থেকে কাল সকালে কোভালাম রওনা হতে পারি।আলেপ্পি তো পথেই পড়বে।

দেখা যাক।আগে কোচিতে পৌঁছই তো।

সুনীল কিন্তু কিছুতেই আজ আমাদের ছাড়তে চাইবে না, তুমি দেখে নিয়ো।

টুকিটাকি কথা চলছে। গাড়িতে ফিরে এসেছে আমুদে মেজাজ। গোয়েন্দা বোনের বুদ্ধির প্যাচে সম্ভাব্য শয়তানকে ঘাড় থেকে ঝেড়ে ফেলা গেছে জেনে সহেলিও নিশ্চিন্ত ম্যাথু টেপ চালিয়ে দিল, বাজছে মলয়ালম গান, তালে তালে মাথা দোলাচ্ছে সবাই। একমাত্র টুপুরের মনটাই যা একটু খচখচ করছিল। মিতিনমাসির যুক্তিগুলো অকাট্য, তবু সে যেন ঠিক পরিপাক করতে পারছে না।মাটুপেট্টির পাজি লোকটাকে কখন দেখল মিতিনমাসি? সে আর মা যখন মালিশ করাচ্ছিল, সেই সময়েই কি দেখেছে রাস্তায়? লোটাকে দেখেও ছেড়ে দেবে, এ তো মিতিনমাসির চরিত্রের সঙ্গে মোটেই মেলে না?

যাই হোক, গানে, গল্পে দিব্যি কেটে গেল রাস্তাটা। পথে একবার মাত্র দাঁড়ানো হল পেরিঙ্গলে, তারপর দেড়টার মধ্যে সোজা কোচি। পেরিঙ্গলেই অল্প-অল্প মেঘ ছিল আকাশে, গাড়ি যখন কোচিতে ঢুকল, মেঘবাহিনী সেখানেও হাজির। জলীয় বাষ্পমাখা বাতাস ঝাপটা মারছে মুখে-চোখে। সমুদ্রের মাথায় ক্ষণে ক্ষণে বিদ্যুৎ ঝলক।

সি-লর্ড জেটির সামনে এসে ঝটাপট সারা হল দুপুরের খাওয়াদাওয়া। সুনীলের সঙ্গে মিনি কথা বলে নিল মোবাইলে।তারপর আড়াইটে নাগাদ সদলবলে দরবার হল গ্রাউন্ড।

পার্কিংয়ে গাড়ি রেখে ঘন সবুজ মাঠটায় বসেছে টুপুররা। মেঘলা দুপুর, অথচ বৃষ্টি নেই, আবহাওয়া ভারী মনোরম।আজ।ছুটির দিন নয়, লোকজনও বড় একটা নেই ময়দানে।দরবার হল সংলগ্ন শিল্প জাদুঘরটিও বন্ধ এখন, খুলবে সেই তিনটের পরে।অনেকটা ফাঁকা জায়গা পেয়ে প্রাণের সুখে ছোটাছুটি শুরু করে দিল বুমবুম।

পার্থ ঘনঘন ঘড়ি দেখছিল। খানিকটা অসহিষ্ণুভাবেই মিতিনকে বলল, তিনটে তো বাজতে যায়, এখনও সুনীলের দেখা নেই কেন?

অবনী বললেন, ব্যস্ত হয়ো না।সুনীল অত্যন্ত পাংচুয়াল, সে কক্ষনো টাইম ফেল করে না।

কথাটুকু খসার যা অপেক্ষা, হঠাৎই টুপুর চেঁচিয়ে উঠেছে, ওই দ্যাখো! ওই দ্যাখো!

চমকে তাকাল সবাই।গর্জন তুলে একটা মোটরবাইক ঢুকছে।গ্রাউন্ডে, আরোহীর কাঁধে অবনীর লাল ব্যাগ! কিন্তু কী আশ্চর্য, আরোহী তো সুনীল নয়!

অবনী উত্তেজিত হয়ে উঠে দাঁড়ালেন, কী ব্যাপার? সুনীল অন্য কাউকে পাঠাল নাকি?

ঠিক তক্ষুনি এক ভয়ংকর কাণ্ড।মোটরবাইকের আরোহী সবে সিট থেকে নেমেছে, অমনিই কোথা থেকে এক সাদা মারুতি তীব্র বেগে প্রবেশ করল চত্বরে, লোকটার সামনে এসে ব্রেক কষল ঘচাং! পলকে দরজা খুলে

বেরিয়ে এসেছে গাঁট্টাগোট্টা চেহারার একটা লোক, আরোহীর বুকে রিভলভার ঠেকিয়ে ছোঁ মেরে কেড়ে নিল ব্যাগটা।

তবে গাড়িতে ফিরতে পারল না। তার আগেই মাঠ ফুড়ে উঠে এসেছে জনা চার-পাঁচ লোক। মাঠেই ছড়িয়েছিটিয়ে বসে ছিল তারা, ছুট্টে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছে ছিনতাইকারীর উপর।তাদের প্রত্যেকের হাতে উদ্যত রিভলভার।হাওয়া বেগতিক দেখে সাদা মারুতির চালক বিদ্যুৎবেগে গাড়ি ঘোরাল, কিন্তু গেট অবধি গিয়েই তার যাত্রা শেষ।প্রবেশদ্বার আটকে দাঁড়িয়ে আছে পুলিশবাহিনী।

গোটা ঘটনাটা ঘটতে সময় লাগল বড়জোর কুড়ি সেকেন্ড।টুপুর থ।চিত্রার্পিত।অবনী ফ্যালফ্যাল তাকাচ্ছেন, সহেলি কাঠ, বুমবুমের চোখ বড় বড়।

দৌড়ে মারুতির সামনে গেল মিতিন।চালকের জানলায় গিয়ে চিবিয়ে চিবিয়ে বলল, ইওর গেম ইজ ওভার মিস্টার পি কে জি কুরুপ।অ্যালিয়াস মিস্টার সেলভান।অ্যালিয়াস শ্রীমান মুথুস্বামী।কিম্বা মিস্টার আয়াপ্পান। ...হায় রে, এত চালাকি করেও সামান্য একটা টোপে আপনি ধরা পড়ে গেলেন? পিরমেডে আজ কটা অবধি ওয়েট করেছিলেন? আমাদের আটকানোর জন্যে? আটটা? নটা? দশটা?

টুপুর আর পার্থও ছুটে এসেছিল।টুপুর দেখল ক্রোধে গনগন করছেন মিস্টার কুরুপ।ভদ্র সভ্য মানুষের মুখোশ-পরা কুরুপের চোখমুখ কী ভীষণ হিংস্র এখন।

পার্থ বলল, কাল রাতে আমাদের ঘাড় ভেঙে প্রচুর খেয়েছ, এখন জেলে বসে লপসি খাও।

শুধু লপসি কেন, গলায় ফাঁসির দড়িও পরতে হতে পারে।সঙ্গে বিক্রমনের খুনটা আছে না?

গেটের বাইরে একটা অ্যাম্বাসার দাঁড়িয়েছিল, সেখান থেকে নেমে এসেছেন সতীশ মেনন স্বয়ং।সঙ্গে সুনীল নালিয়াথ।

সতীশ হাত বাড়িয়ে দিলেন মিতিনের দিকে, থ্যাঙ্ক ইউ ম্যাডাম।আপনার জন্যই এরকম এক কুখ্যাত ক্রিমিনাল আজ ধরা পড়ল।

মিতিন হেসে বলল, আমি তো নিমিত্ত মাত্র।ওদের ধরিয়ে দিল তো আমার জামাইবাবুর লাল ব্যাগ।এনিওয়ে, গ্রেট স্ক্রলটা ব্যাগ থেকে বের করে নিয়েছেন তো?

বিলক্ষণ।ছাতা সমেত।

কুরুপ সাহেবের দোসরটির রিভলভারখানাও যত্ন করে রাখবেন কিন্তু ব্যালিস্টিক রিপোর্টে সম্ভবত প্রমাণ হবে, ওই রিভলভারের গুলিতেই মারা গেছে সিনাগগের কর্মচারীটি।

নিশ্চয়ই রাখব।পরামর্শের জন্য ধন্যবাদ।

মাঠে ঘাপটি মেরে বসে থাকা প্লেন ড্রেসের পুলিশরাই হাতকড়া পরিয়ে ভ্যানে তুলছে কুরুপ আর তার সঙ্গীকে।পাশ দিয়ে যাওয়ার সময়ে সাঙাতটিকে ভাল করে দেখল টুপুর।মুখ-ভর্তি বসন্তের দাগ।

.

১২.

সন্ধে নেমেছে মাট্টানচেরিতে।বৃষ্টি পড়ছে ঝিরঝির।জু টাউনের রাস্তা জলে-কাদায় মাখামাখি।তারই মধ্যে জোস হ্যালেগুয়ার ঘর আজ উপচে পড়েছে মানুষের ভিড়ে।টুপুররা ছাড়াও আছে সুনীল, আছেন সতীশ

মেনন।মাট্টানচেরি থানা থেকে এসে গেছেন পি ভি জর্জও।বেশ কয়েকটি প্রতিবেশী ইহুদি পরিবারও উজ্জ্বল মুখে জমা হয়েছে দরজায়।আর এমন একটা দিনে সাইমন পেরেজও যে উপস্থিত থাকবেন এ তো বলাই বাহুল্য।

গ্রেট স্ক্রল ফিরে গেছে সিনাগগের দেওয়ালসিন্দুকে।বিশেষভাবে তৈরি একটি ছাতার বাঁটের গোপন ফাঁকে গোল করে গুটিয়ে রাখা হয়েছিল গ্রেট স্ক্রল ।নেহাতই মামুলি চেহারার কালো ছাতা, তবে ডাঁটির নির্দিষ্ট স্থানে চাপ দিলে লম্বা রডটি খুলে যায়।তখন ওই ফাঁপা রডে ক্যালেন্ডারের মতো কিছু ঢুকিয়ে দেওয়া মোটেই কঠিন নয়।

জোস হ্যালেগুয়া ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখছিলেন অভিনব ছাতাটিকে। সতীশ মেননকে ছাতা ফেরত দিয়ে প্রশ্ন করলেন, কিন্তু ম্যাডাম, অনুমান করলেন কী করে এমন একটি ছাতার মধ্যে আমাদের পবিত্র পেন্টাটিউক রক্ষিত আছে?

স্মিত মুখে মিতিন বলল, সত্যি বলতে কী, আমিও আন্দাজ করতে পারিনি।মিস্টার মেনন যখন এখান থেকে জানালেন ব্যাগে দুটো ছাতা আছে, তখনই ব্যাপারটা আমার কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল।কারণ ব্যাগে দ্বিতীয় ছাতাটি তো থাকার কথা নয়।তবে হ্যাঁ, পবিত্র লিপিটিকে যে আমাদের ব্যাগেই চালান করা হয়েছিল, এটা আমি কয়েকটা ঘটনা অনুধাবন করে নিশ্চিত হয়ে গেছিলাম।

কী রকম?

অনেকগুলো সুতো পরপর জোড়া দিয়ে।যেমন, চুরির দিন রাত্তিরেই আমার সন্দেহ হয় একটা অটোরিকশা হোটেল অবধি আমাদের ধাওয়া করেছে।আপাতভাবে কোনও কারণ না থাকা সত্ত্বেও।পরদিন মুন্নারের পথ থেকে হোটেলে ফোন করার সময়ে খবর পেলাম ভোরবেলা আমরা বেরনোর পরপরই কেউ একজন আমাদের খুঁজতে এসেছিল।কোচিতে সুনীল ছাড়া আর কে-ই বা আমাদের খোঁজ করতে পারে? কেনই বা করবে? মিস্টার মেনন কোনও কারণে এসেছিলেন কী? তাহলে তো তিনি পরিচয় দিতেন। আর দুজন সদ্যপরিচিত, মিস্টার হ্যালেগুয়া এবং মিস্টার পেরেজেরও তো জানার কথা নয় আমরা কোন হোটেলে উঠেছিলাম! এর পর মুন্নার পৌঁছে সুনীলের সঙ্গে যোগাযোগ করে মারাত্মক সংবাদটি পেলাম।চুরির রাতেই রেবতী ইন্টারন্যাশনালের কাছাকাছি একটি অটোরিকশায় নাকি খুন হয়েছে সিনাগগের কর্মচারীটি।তখনই আমার মনে কেমন খটকা জাগল।তা হলে কি আমাদের ফলো করার সন্দেহটা অমূলক নয়? কিন্তু তখনও বুঝতে পারছি না কেন ফলো করবে! এর পর দুবার আমাদের উপর অ্যাটেমপ্ট হল।প্রথমবার মুন্নার ক্লাবে। দ্বিতীয়বার মাটুপেট্টি ড্যামে।দুবারই আক্রমণকারীর টার্গেট লাল ব্যাগ।প্রথমবার চোর আঁকশি দিয়ে লাল ব্যাগটাই টেনেছিল।আর মাটুপেট্টিতে একটা লোক গাড়ি ভাড়া করে এসে, স্পিডবোটকে পাঁচশো টাকা দিয়ে, ভরদুপুরে একটা প্রায় ফাঁকা লাল ব্যাগ ছিনিয়ে নিয়ে চলে গেল।লোকটা আমার হাজব্যান্ডের ক্যামেরাটা স্বচ্ছন্দে টানতে পারত, কিন্তু নেয়নি।তার মানে, হয় সে ভুল করে ছিনতাই করেছে, নয়তো সে লাল ব্যাগটাকেই চেয়েছিল।উইথ দ্য এক্সপেক্টেশান লাল ব্যাগে অনেক মূল্যবান একটা কিছু আছে।এবং লোকটা মোটেই সাধারণ ছিনতাইবাজ নয়, তা হলে সে গাড়ি ভাড়া করে আসত না।হ্যাঁ, গাড়িটা যে ভাড়ার তা আমি একঝলক নেমপ্লেট দেখেই বুঝে গেছি।তখনই আমি ভাবতে শুরু করলাম মূল্যবান জিনিসটি কী হতে পারে? মনে পড়ে গেল সিনাগগে দ্বিতীয়বার ঢোকার সময়ে জামাইবাবুর লাল ব্যাগখানা টিকিট কাউন্টারের ছেলেটির সামনেই রাখা ছিল।এবং আমার হাজব্যান্ডের ব্যাগটি আর জামাইবাবুর ওই ব্যাগ হুবহু এক।এর পর তো দুয়ে-দুয়ে চার করা এমন কিছু কঠিন নয়।

টুপুর বলে উঠল, তার মানে তুমি বলতে চাও মিস্টার কুরুপ আর তার চ্যালা পার্থমেসোর ব্যাগটাকে বাবার ব্যাগ ভেবেই বারবার হাতানোর চেষ্টা করছিল?

অবশ্যই।ওরা তো কেউই কখনও দুটো ব্যাগ এক সঙ্গে দেখেনি।এমনকী সিনাগগের ছেলেটাও না।ওরা জানবে কী করে, তোর বাবা ব্যাগ হোটেলে ফেলে এসে ওদের জন্য একটা বিদঘুটে হেঁয়ালি তৈরি করে

দিয়েছে?

সতীশ মেনন তারিফের সুরে বললেন, যাই বলুন ম্যাডাম, কুরুপের মতো ক্রিমিনালকে আইডেনটিফাই করাটা কিন্তু একটা মারভেলাস কাজ।

মোটেই না। কুরুপমশাই এত ভুল করেছেন, তাঁকে না ধরতে পারাটাই চরম বোকামি হত। শুনবেন তার গলতিগুলো? ভালমানুষ সেজে যেচে আলাপ করার সময়ে নিজের পরিচয় দিলেন ওয়াইল্ড লাইফ ফোটোগ্রাফার বলে। জানালেন তিনি নাকি জঙ্গলে-জঙ্গলে ছবি তুলে বেড়াচ্ছেন। অথচ তার পায়ে সব সময়ে শৌখিন জুতো, যা মোটেই বনেবাদাড়ে ঘোরার উপযুক্ত নয়। হতে পারে তাঁর জঙ্গলের জুতো আর লোকালয়ের জুতো আলাদা, কিন্তু পর পর আরও কয়েকটা গণ্ডগোল যে করে ফেললেন তিনি। মুন্নারে কফির টেবিলে বাঘের ঘ্রাণশক্তি সম্পর্কে যে ভুল মন্তব্য করলেন, তাতেই বোঝা যায় বন্যপ্রাণী সম্পর্কে তার কত জ্ঞান! এর সঙ্গে আবার রাজস্থানে কস্তুরীমৃগ? উফ, হরিবল। এর পর লাঠির ডগায় আঁকশি লাগিয়ে মুন্নার ক্লাবে ব্যাগ চুরি করতে পাঠালেন, অথচ খেয়ালই করলেন না, লাঠির গায়ে হোটেল ক্রিস্টাল প্যালেসের চিহ্ন জ্বলজ্বল করছে। লাঠিটি নেহাতই হোটেল ক্রিস্টাল প্যালেসের খাটের একটি ছত্রী। পেরিয়ারে তিনি গায়ে পড়ে আমাদের সঙ্গ দিতে রাজি হলেন, তাঁর গাড়িতে পেরিয়ার লেকে যাওয়ার সময়ে স্পষ্ট টের পেয়ে গেলাম তিনি আদৌ ইডুক্কির জঙ্গলে যাননি।

টুপুর ফের জিজ্ঞেস করে বসল, কী করে বুঝলে?

মুন্নারে লোকটা তোকে আর আমাকে গাড়িতে লিফট দিয়েছিল, মনে আছে?

হ্যাঁ, কিন্তু

এই জন্যই তো বলি চোখ-কান খোলা রাখ। মুন্নারেই আমি গাড়ির কিলোমিটারটা দেখে নিয়েছিলাম। এমনিই দেখেছিলাম। চোখে পড়ে গিয়েছিল। মুন্নার টু পেরিয়ার একশো ছ কিলোমিটার মতো রাস্তা। ভায়া ইডুক্কি হলে অন্তত তিরিশ কিলোমিটার বেশি। অথচ পেরিয়ারে দেখলাম কুরুপের গাড়ি চলেছে মাত্র একশো ষোলো কিলোমিটার। এর থেকে কী বোঝা যায়, অ্যাঁ? এত প্রমাণ পাওয়ার পরও লোকটাকে সন্দেহ হবে না? আর পেরিয়ারে ওর গাড়িতে বসে সবচেয়ে মোক্ষম প্রমাণটাও তো আমার মুঠোয় এসে গেল। দাবার ঘুঁটি। যে দাবার সেটটা তোর মেসোর লাল ব্যাগে ছিল তার একটা কালো পন। পেলাম কুরুপের ড্রাইভিং সিটের ঠিক নীচে। সাঙাত ছিনতাই করে আনার পর ব্যাগ হাতড়ে আসল জিনিসটি না পেয়ে পথেই ব্যাগটিকে পরিত্যাগ করেছিল কুরুপ, কিন্তু ঘাঁটাঘাঁটির সময়ে এই বোড়েটি পড়ে যায় গাড়ির ভিতর। গাড়ির ফ্লোর ম্যাটটাও কালো, বোড়েটাও কালো, তাই বেচারার নজরে পড়েনি। ব্যস, তখনই আমার আর বুঝতে বাকি রইল না মাটুপেট্টির ঘটনায় নাটের গুরুটি কে! পেরিয়ারের রেস্টুরেন্টে খবরের কাগজের রিপোর্টটা আরও বেশি নিঃসংশয় করে দিল। কুরুপ যে একজন ভাল গাইড ছিল, সেই পরিচয়ও তো আমরা পদে-পদেই পেয়েছি। পাইনি?

সতীশ মেনন বললেন, আপনার ফোন পাওয়ার পর থেকে আমি কিন্তু খুব চিন্তায় ছিলাম ম্যাডাম। যদিও কুমিলি থানায় ইন্টিমেশান পাঠিয়ে দিয়েছিলাম, তবু লোকটা যা খতরনাক ভয় ছিল পথে না অ্যাক্সিডেন্ট-ফ্যাক্সিডেন্ট কিছু ঘটিয়ে দেয়।

দুশ্চিন্তা আমারও ছিল মিস্টার মেনন। মিতিন মাথা দোলাল, লোকটাকে চার এগিয়ে দিয়ে আমিও স্বস্তিতে থাকতে পারিনি। বিশেষ করে লোকটা যখন আমাদের পিরমেডে থামার কথা বলল, তখন আরও বেশি সাবধান হয়ে গেলাম।

জর্জ গোঁফে মোচড় দিতে দিতে এতক্ষণ শুনছিলেন সব। হঠাৎ মাথা ঝুঁকিয়ে বললেন, আমি তো আগেই বুঝে গিয়েছিলাম চুরিটা কোনও পাকা মাথার কাজ। এখান থেকে যে অটোটা ছিনতাই হয়েছিল, তার ড্রাইভারকে

আমি কষে জেরা করেছিলাম।তার বর্ণনা মতোই তো আর্টিস্ট ছবি আঁকল।মেনন সাহেবও বুঝে গেলেন তিন শয়তানের মধ্যে অন্যতমটি হল টি জোসেফ।দ্য নটোরিয়াস অ্যান্টিক স্মাগলার।

সতীশ বললেন, ঠিক কথা।আমরা ওকেই খুঁজছিলাম।কিন্তু যাই বলুন, জোসেফ কাম কুরুপকে পাকড়াও করার কৃতিত্বটা কিন্তু পুরোপুরি ম্যাডামেরই।

জোস হ্যালেগুয়া বললেন, অবশ্যই।মাট্টানচেরির ইহুদিরা চিরকাল ম্যাডামের কথা স্মরণে রাখবে।

সাইমন পেরেজ বললেন, আমার শুধু খারাপ লাগছে বিক্রমনের জন্যে।লোভে পড়ে কী যে করে ফেলল। বেঘোরে প্রাণ গেল ছেলেটার।

হুম।কিন্তু একটা ব্যাপারে আমি এখনও ক্লিয়ার হতে পারলাম না সাইমন।জোস দাড়িতে হাত বুলোচ্ছেন, শনিবার চুরি করেও কেন গ্রেট স্ক্রল পাক্কা একটি দিন নিজের কাছে রেখে দিয়েছিল বিক্রমন? কেন আগেই পাচার করেনি?

আপনার ধারণাটা সঠিক নয় মিস্টার হ্যালেগুয়া।চুরিটা শনিবার হয়নি।

মিতিনের কথায় থতমত খেলেন জোস হ্যালেগুয়া, তবে?

চুরি রবিবারই হয়েছে।আমরা সন্ধেবেলা সিনাগগে ঢোকার জাস্ট আগে।সিনাগগে ভিজিটিং আওয়ার শেষ হওয়ার পরে-পরেই সিকিউরিটি গার্ডদের কাজে সামান্য হলেও ঢিলেমি আসে।সেই সুযোগটাই ব্যবহার করেছিল বিক্রমন।প্রায় সঙ্গে-সঙ্গে আমরা এসে পড়ায়, এবং চুরিটাও আবিষ্কার হয়ে যাওয়ায় সে খুব নার্ভাস হয়ে পড়ে।যতই যোক পেশাদার অপরাধী তো নয়, তাই ঘাবড়ে গিয়ে ছাতাখানা তাড়াতাড়ি ঢুকিয়ে দেয় আমাদের ব্যাগে।

সাইমন বললেন, ছাতাখানা হাতে নিয়ে পুলিশের সামনে এলেও তো কেউ বুঝতে পারত না তার ভিতরে কী আছে।

মিতিন বলল, সাহস পায়নি।লোভে পড়ে পাপ কাজ করে ফেলেছিল তো।

জোস বললেন, জিহভা কখনওই অধর্ম বরদাস্ত করেন না।আমার বিশ্বাসের সুযোগ নিয়ে সে যে পাপ করেছে তার শাস্তি তো তাকে পেতেই হবে।

মিসেস জোস বললেন, পেন্টাটিউক নিজেই নিজেকে রক্ষা করেছে।

আরও কয়েকটা খুচখাচ কথার পর সতীশ উঠে দাঁড়িয়েছেন।মিতিনকে বললেন, এবার যাবেন তো ম্যাডাম?

ও সিওর।মিতিনের চোখ ঘড়িতে, আটটা বাজে, এবার তো হোটেলের সন্ধানে যেতে হয়।

অবনী বললেন, খোঁজাখুঁজির কী দরকার, রেবতী ইন্টারন্যাশনালই তো আছে।কী বলো, সুনীল?

সুনীলের বাসনা স্যারসমেত টুপুররা আজ তার বাড়িতেই থাকুক।মিতিনের কেরামতিতে সে অভিভূত, খোদ ডিটেকটিভের মুখ থেকে সে আরও তদন্তের গল্প শুনতে চায়।অবনী তাকে কোনও মতে ক্ষান্ত করলেন। সুনীলদের ছোট বাড়িতে এতজন মিলে হামলা করার কোনও মানে হয়?

জু টাউনের গলিতেই গাড়ি রেখেছিল ম্যাথু।জোস হ্যালেগুয়া, সাইমন পেরেজসহ উপস্থিত ইহুদিরা এলেন কোয়ালিস পর্যন্ত।মিতিনকে বিদায় জানাতে।ভারী কৃতজ্ঞ ভঙ্গিতে অনুরোধ করলেন আবার মাট্টানচেরিতে আসার জন্যে।

সতীশ মেননের জিপের পিছু পিছু রওনা দিল ম্যাথু।মশলাপট্টি পেরিয়ে এসে পার্থ বলে উঠল, একটা ব্যাপার খেয়াল করেছ? জোস হ্যালেগুয়া কিন্তু প্রমাণ করে দিয়েছেন তিনি একজন সাচ্চা ইহুদি।

কীভাবে?

দু-দুবার ওঁর বাড়িতে এলাম, একবারও চা পর্যন্ত খাওয়ালেন না। কী কিপ্টে, বাপস। অন্তত এবার তো রাবিমশাই আমাদের একটু আপ্যায়ন করতে পারতেন।

পার্থর বলার ঢঙে হো-হো হাসির ফোয়ারা উঠল।